# অনাগত

## উৎসর্গ পত্র

যাঁহারা যুগে যুগে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ
করিয়া ধন্য হইয়াছেন,
বাঙ্গলার সেই চির-তরুণদের নামে
এই "অনাগত" কথা
উৎসর্গ করিলাম।

# গ্রন্থকারের নিবেদন

সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন না হইলেও, কথা-সাহিত্যের দরবারে এই আমার প্রথম প্রবেশ। বিচারে, দণ্ড বা পুরস্কার, কি লাভ হইবে জানি না।

বাঙ্গলার প্রবীণ সাহিত্য-রথী শ্রীযুত জলধর সেন, সুপ্রসিদ্ধ কবি বন্ধুবর শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব এবং উদীয়মান ঔপন্যাসিক স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ শচীন্দ্রলাল রায়, এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাকে উৎসাহ দিয়া ও নানারূপে সাহায্য করিয়া, অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়,<br>
কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।<br>
৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

# অনাগত

## প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে ডাঃ মৈত্রের বাড়ীখানি ছোট হইলেও বেশ সুদৃশ্য। বাড়ীর সমুখেই ছোট একটু বাগান, তাহার অদূরেই গঙ্গা। ডাঃ মৈত্রকে প্রায়ই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারের এই বাগানে বেড়াইতে দেখা যাইত। বন্ধুরা এজন্য রহস্য করিয়া বলিতেন, "তুমি ডাক্তার না হয়ে কবি হলেই ঠিক হ'ত"। ডাক্তারও দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি হাসিয়া জবাব দিতেন—"উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ," তাছাড়া এ দুয়ের মধ্যে যে কোন শত্রুতা আছে, তা আমি মনে করি নে; এ যুগে একাধারে ডাক্তার ও কবি, এমন লোকও বিরল নহে; সে যুগের তো কথাই নাই, তখনকার চিকিৎসকেরাই ছিলেন কবিরাজ।" ইহার পর হার মানিয়া বন্ধুদিগকে নিরস্ত হইতে হইত। ডাঃ মৈত্র কিছুদিন হইল এই বাড়ীর মায়া, সঙ্গে সঙ্গে ইহলোকের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বিধবা পত্নী শ্যামমোহিনী ও দুইটী পুত্রকন্যা তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।

ডাঃ মৈত্রের বাড়ীর সম্মুখের বাগানে দুইটী তরুণী বেড়াইতেছিল। সূর্য্যাস্তের সোনালী আভা তখনও পশ্চিম দিগন্তে মিলাইয়া যায় নাই। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রের পর গঙ্গাশীকরবাহী সমীরণ আসিয়া বৃক্ষপত্রাবলী

আন্দোলিত করিতেছিল। তরুণীদের কপোলচুম্বিত অলকগুচ্ছ দুলিতেছিল, বস্ত্রাঞ্চল পুনঃ পুনঃ স্থানচ্যুত হইতেছিল, চেষ্টা করিয়াও তাহারা তাহা সংযত করিতে পারিতেছিল না।

তরুণীদের মধ্যে একজন ডাঃ মৈত্রের কন্যা অনিন্দিতা। অনিন্দিতা রূপসী, কিন্তু এ রূপ ললিত সুকুমার নহে; তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণের মধ্য দিয়া একটা তেজ ঠিকরিয়া পড়িতেছিল; দেখিলেই মনে হয়, এ রূপের যেন দাহিকা শক্তি আছে, ইহাকে সহজে স্পর্শ করা যায় না। তরুণীর ঈষৎ উন্নত নাসিকা ও নির্ম্মল ললাটে দৃঢ় সঙ্কল্পের রেখা অঙ্কিত, চক্ষু উজ্জ্বল, প্রতিভাব্যঞ্জক। অপর তরুণী অনিন্দিতারই সমবয়স্কা, প্রতিবাসী করুণাময় বাবুর কন্যা প্রতিমা। প্রতিমাও সুন্দরী, তবে অনিন্দিতার সঙ্গে তাহার রূপের তুলনা করিলে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রতিমা শ্যামাঙ্গিনী, তাহার সেই রূপ বাঙ্গলারই খাঁটী নিজস্ব রূপ; সে স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ—বাঙ্গলার আকাশের নীলিমা, তরুবীথির স্নিগ্ধ ছায়া, স্রোতস্বিনীর সরসমাধুর্য্য পান করিয়া যেন পুষ্ট হইয়াছে। বিশাল আয়ত লোচন, স্নেহ ও করুণায় কোমল। করুণাবাবু সাধ করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন—প্রতিমা—সত্যই দেবী-প্রতিমার মতই সে সুন্দরী।

মৃদুতরঙ্গান্দোলিত গঙ্গাবক্ষ তখনও সোনালী আভায় রঞ্জিত। প্রতিমা মুগ্ধনেত্রে সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বলিল—"অনি, তোকে কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আগেই যেতে হবে, কেননা তুই-ই হবি আমার জন্মতিথি উৎসবের নেত্রী, তোকেই সব উদ্যোগ আয়োজন, অতিথি সৎকার করতে হবে। আর মোহিত-দাকে তুই-ই নিমন্ত্রণ করবি।"

অনিন্দিতা মৃদু হাসিয়া বলিল—"না ভাই, আমি সে ভার নিতে পারবো না, নিজের ভার বরং নিজে নিতে পারি। দাদা কোন স্বদেশীর দল বা শিকার পার্টীর মোড়ল হয়ে হল্লা করে বেড়াচ্ছে, তার ঠিকানা নাই।

শুনছি, আবার নাকি কোন একটা বড়দলের সঙ্গে জুটে সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে যাবে। মা তো ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।”

প্রতিমার ললাটে মুহূর্ত্তের জন্য ঈষৎ চিন্তার রেখা পড়িল, কিন্তু হাসিতে হাসিতে বলিল,

“যেমন ভাই, তেমনি বোন, তুইও তো ছোট খাট একটী সাফ্রেজিট্ হয়ে উঠেছিস্। সেদিন তোদের কলেজের ললিতা-দি মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তোর কথায় বললেন, মেয়েটার বুদ্ধি ছিল, কিন্তু এত বেশী পাকা হয়েছে যে ওর আর কিছু লেখাপড়া হবে কিনা সন্দেহ। মা হেসে বল্লেন, ‘ওকে বরং পাড়াগাঁয়ের কোন একটা জবরদস্ত জমিদারের হাতে সঁপে দিলেই ঠিক হয়।’ হ্যাঁ ভাই, তুই কি এতই দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছিস ?”

“হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমিতো আর তোমার মত অমন সুশীলা লক্ষ্মীমণিটি নই। আমাকে না হয়, পাড়াগাঁয়ের দুঁদে জমিদারের শ্রীচরণে নৈবেদ্য দেওয়া হবে, কিন্তু তোমার পক্ষে কি ব্যবস্থা হবে ? এমন ‘অনাঘ্রাত পুষ্পং কিশলয়মমলং’—এ কি কোন নামজাদা বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টারের জন্যই সঞ্চিত হয়ে আছে !”

অনিন্দিতার কথায় প্রতিমা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, —“দূর দূর, তারা কি আর তোর সখীর কালোরূপ পছন্দ করবে, তারা যে সাগর পারে পিঙ্গলকেশা, বিড়ালাক্ষীদের দেখে এসেছে, সেই আদর্শ, ধ্যানজ্ঞান।”

অনিন্দিতা হাসিল না, সে অন্যমনস্কভাবে একটা বেলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল,—“মেয়েদের উপর কেন যে এই অত্যাচার, অনেক সময় আমি বুঝে উঠতে পারিনে। তাদের সকলকেই কোন না কোন একজন পুরুষের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিতে হবে। এর কি এমনই একান্ত প্রয়োজন ?

আর পুরুষেরা সকলে মিলে লিখে পড়ে এমন পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছে যে, মেয়েদের টু ঁ শব্দটী করবার জো নেই ;—তাদের হাত মুখ বেঁধে ঠিক যেন জলে ফেলে দেওয়ার মতো ! আবার লক্ষ্মীমণি চরিত্রের কি মাহাত্ম্য ! স্বামী কালো হোক, খোঁড়া হোক, জলজ্যান্ত অজ মূর্খ হোক, নিষ্কর্ম্মা বয়াটে হোক, তাকেই দেবতা বলে মানতে হবে, নইলে নরকেও স্থান নেই !”

অনিন্দিতার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, উত্তেজনায় তাহার নিঃশ্বাস দ্রুত পড়িতে লাগিল।

প্রতিমা স্নিগ্ধস্বরে বলিল,—“অত চটিস্ কেন ভাই ! যে-সব মুনি ঋষিরা এই সমস্ত বিধিব্যবস্থা করে গেছেন, তাঁরা কি আর সব দিক ভেবে চিন্তে দেখেন নি, কেবলই মেয়েদের ফাঁকি দেবার জন্য, দাসী বাঁদী করে রাখবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন ? আমার তো পুরুষ জাতিকে এতটা বর্ব্বর মনে হয় না। আর সত্যই কি মেয়েরা পুরুষদের বাদ দিয়ে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে জীবনের পথে চল্‌তে পারে ?”

অনিন্দিতার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতিমার দিকে চাহিয়া অনুযোগের সুরে কহিল,

“প্রতিমা, তুই এরই মধ্যে এসব বড় বড় কথা কোথায় শিখলি বল্‌তো ! যে পণ্ডিত মশায় বাড়ীতে তোকে সংস্কৃত পড়াচ্ছেন, তিনিই বোধ হয় এ সব গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা বলেছেন। আমি না হয় সাফ্রেজিট, কিন্তু তুই যে দেখছি খাঁটী সনাতনী,—সীতা সাবিত্রীর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে উঠেছিস্ !”

অনিন্দিতা ও প্রতিমা কথা বলিতে বলিতে বাগান হইতে বাহিরের বারান্দায় উঠিয়াছে, এমন সময় মোহিত ফটক পার হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার একটু ব্যস্ত সমস্ত ভাব, প্রতিমাকে লক্ষ্য না করিয়াই সে অনিন্দিতার উদ্দেশ্যে বলিল,—

“অনি, আমাদের শিকারপার্টির সব ঠিক, ৩।৪ দিনের মধ্যেই যেতে

হবে। তুই আমার জিনিষগুলো সব গুছিয়ে দিস্ তো, তোর তো সব জানাই আছে—"

অনিন্দিতা ঈষৎ চিন্তিতভাবে বলিল, "তুমিতো শিকার পার্টিতে যাচ্ছ, এ দিকে মা যে ভেবে সারা, বলছেন, বাঘ ভালুকের মুলুকে যদি কোন বিপদ ঘটে—"

মোহিত উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "মার যে সব কথা! আমি কি আর একা যাচ্ছি, না আমি শিশু! কিন্তু তাঁকে দোষ দেওয়া বৃথা,—এ যে বাঙ্গালীর আজন্ম সংস্কারের ফল, এ সব সংস্কার ভাঙ্গতে হবে। তুই মাকে বুঝিয়ে বলবি—"

অনিন্দিতা অভিমানপূর্ণস্বরে কহিল—"তুমি নিজেই মাকে বুঝিয়ে বল না কেন, তাঁর হয়ত রাত্রে ঘুম হবে না। তার পর তুমি একবার বেরুলে কবে যে ফিরবে, তারও তো ঠিকানা নাই!"

প্রতিমা একটু কুণ্ঠিতভাবে অনিন্দিতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার সে প্রতিমার কাণে কাণে বলিল—"আমার নিমন্ত্রণের কথাটা মোহিত দাকে বলনা ভাই!"

অনিন্দিতাও প্রতিমার অস্তিত্ব যেন ভুলিয়া গিয়াছিল, সে অপ্রস্তুত হইয়া একটু জোরের সঙ্গেই মোহিতকে বলিল—

"দাদা, তোমার—ঠিক শিকারের বাতিক হয়েছে। প্রতিমা যে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তা এতক্ষণ তোমার চোখেই পড়ল না! একে 'লেডি,' তাতে 'গেষ্ট,' ও কি মনে করবে বল দেখি!"

মোহিত ঈষৎ লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিল, —"বড় ভুল হয়ে গেছে প্রতিমা, মাপ কর আমাকে; তুমি যে এসেছ, তা আমি জানতেই পারিনি—!"

প্রতিমা মৃদু হাসিয়া বলিল—"মাপ করতে পারি মোহিত দা, যদি

আমার জন্মতিথিতে আমাদের বাড়ী যাও। অনিতো যাবেই, মা বার বার বলে দিয়েছেন।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়! এত সহজে এবং এমন লোভনীয় ভাবে ক্ষমা লাভ করবার ভরসা থাকলে, অপরাধ করবার ইচ্ছাই বেড়ে যায়।"

অনিন্দিতা হাসিয়া বলিল—"প্রতিমার বেলায় তো তুমি কল্পতরু। কিন্তু তোমার শিকার পার্টি ফেলে যেতে পারবে তো।"

প্রতিমার মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে করুণ দৃষ্টিতে মোহিতের দিকে চাহিল।

মোহিত ব্যস্তভাবে বলিল—"অনির কথায় তুমি দুঃখিত হয়োনা প্রতিমা। আমি নিশ্চয়ই তোমাদের বাড়ী যাব। আমি কি জ্যাঠাইমার কথা ঠেলতে পারি—"

অনিন্দিতা বিদ্রূপের সুরে বলিল—"জ্যাঠাইমার হুকুমই সব, প্রতিমার অনুরোধটা কিছুই নয়! দেখলি ভাই, দাদা তোকে কেমন খেলো করে দিলে। অথচ আমি নিশ্চয় জানি, তোর হুকুম বা অনুরোধ অমান্য করবার শক্তি দাদার নেই!"

মোহিত ঈষৎ গম্ভীর ভাবে অনিন্দিতার দিকে চাহিয়া বলিল—"ছি, অনি, সব সময়ে ছেলেমানুষী করা ভাল নয়।"

প্রতিমার অজ্ঞাতসারেই তাহার কর্ণমূল ঈষৎ রাঙা হইয়া উঠিল, ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইল, সে তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিবার জন্যই বলিল,—

"আচ্ছা, মোহিত দা, শিকার ক'রতে তোমার মায়া হয় না? একটা নিরীহ জীবকে লক্ষ্য ক'রে গুলি করবার সময় হাত একটুও কাঁপে না? আমাদের বাড়ীতে একটি হরিণ শিশু ছিল। আমি তো ভাবতেই পারিনে, তার সেই সজল করুণ চোখ দুটী ও ভয়-কাতর মুখের দিকে চেয়েও, কি ক'রে মানুষ তার উপর মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ ক'রতে পারে।"

মোহিত হাসিল।

"সব জীবই কি হরিণ শিশুর মত নিরীহ প্রতিমা? আর আমরা কি কেবল নিরীহ দুর্ব্বল হরিণ শিশুকেই শিকার ক'রে বেড়াই? সুন্দরবনে যে এত বাঘ ভালুক বুনো শূয়োর রয়েছে, তারাও কি হরিণ শিশুর মতোই নিরীহ! এরা মানুষের চিরশত্রু, সুযোগ পেলেই মানুষের রক্ত চুষে খায়, আত্মরক্ষার জন্য এদের ধ্বংস করাই মানুষের প্রবৃত্তি। মানুষ যখন বনজঙ্গলে বাস করতো, তখন থেকেই এই সব হিংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বাঁচতে হয়েছে; নইলে মানুষ লোপ পেত। এখনও যারা বন্যজাতি, তারা প্রতি মুহূর্ত্তে এই ভাবেই আত্মরক্ষা করছে।"

প্রতিমা মোহিতের এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না। সে ঈষৎ ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—"কিন্তু মানুষ তো আর এখন বুনো বা অসভ্য নয়! সেই আদিম যুগের হিংস্র প্রবৃত্তি সে কি এখনও ছাড়তে পারে না? অনর্থক কতকগুলা পশুকে বন জঙ্গলে তাড়া করে হত্যা করাই কি বীরত্বের লক্ষণ? হিংসায় মানুষকে কেমন পশু করে তোলে, তা ভেবে আমি সময় সময় শিউরে উঠি। একবার বাবার সঙ্গে পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ীটা ছিল ঠিক সমুদ্রের ধারেই। একদিন দুপুর বেলায় এক বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়লো। একজন সাহেব গোটা ১০।১২ পাখী শিকার করেছে। তার এক কাঁধে বন্দুক, আর এক কাঁধে দড়ি দিয়ে বাঁধা নিহত পাখী গুলি ঝুলছে, আর তাদের মৃতদেহের রক্তে সাহেবের সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত। ওঃ—ঠিক যেন একটা রাক্ষস কি দানব! সে মূর্ত্তি আমি জীবনে ভুলতে পারবো না, মনে করলে এখনও শিউরে উঠি!"

মোহিত কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তার পর কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে প্রতিমার দিকে না চাহিয়াই বলিল—

"হিংসা ভাল, কি অহিংসা ভাল, এ বড় জটিল সমস্যা, প্রতিমা,— চিরকাল এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক চলছে। আমার এমন জ্ঞান

নেই, যাতে তোমাকে কথাটা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি। কিন্তু হিংসাও যে অবস্থা বিশেষে মানুষের পক্ষে উচ্চতর ধর্ম্ম, অহিংসাই পাপ, দুর্ব্বলতা, তাতে আমার সন্দেহ নেই। যদি তোমার যুক্তি শুনে সব মানুষই হিংসা পরিত্যাগ করতো, তাহলেই তারা যে খুব সভ্য বা ধার্ম্মিক হয়ে উঠতো, এ আমি মনে করিনে। বরং তাতে কাপুরুষতাই বেড়ে যেত,…দেশ, ধর্ম্ম, সমাজ, নারীর মর্য্যাদা, কিছুই মানুষ রক্ষা করতে পারতো না। একদিন বৌদ্ধপ্রভাবে ভারত এই ভুল পথে চলেছিল, আর আজও আমরা তার প্রায়শ্চিত্ত করছি।—"

অনিন্দিতা হাসিয়া বলিল,—"দাদা, তুমি যে খাঁটী বক্তৃতা সুরু করে দিলে দেখ্ছি। কিন্তু প্রতিমা তো আজ তোমার কাছে, গূঢ় ইতিহাসের তত্ত্ব শুনতে আসেনি। সেজন্য না হয়, আর একদিন 'সমিধকুশ হস্তে' আসবে।"

মোহিত ইহার উত্তরে ঈষৎ উত্তেজিতভাবে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়, শ্যামমোহিনী বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—

"তোরা সব এখানে দাঁড়িয়েই জটলা করবি, না ভিতরে যাবি? প্রতিমা আয় মা—" বলিয়া শ্যামমোহিনী তাহার হাত ধরিলেন এবং মোহিতের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন—

"সারাদিন টো টো করে ঘুরে কি চেহারাই হয়েছে। একদিনও বাড়ী থেকে না বেরুলে চলে না বুঝি! ভব ঘুরে, না, টো টো কোম্পানি, কোন দলে নাম লিখিয়েছ, শুনি! আবার নাকি কোন জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে যাবে?"

মোহিত কোন উত্তর দিল না, মায়ের কথায় শুধু একটু হাসিল। শ্যামমোহিনী যাইতে যাইতে আপন মনে বলিলেন—"কি ছেলেই যে হয়েছেন! পাড়ায় আরও তো দশটা ছেলে আছে, কই কেউতো এমন নিষ্কর্ম্মা, ভবঘুরে নয়! আমারই যত অদৃষ্টের দোষ!"

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাল্যকাল হইতেই মোহিত ডানপিটে ছেলে বলিয়া খ্যাতি বা অখ্যাতিলাভ করিয়াছিল। পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সর্দ্দার হইয়া যত রকম অপকার্য্য করাই তাহার নিত্যকর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। প্রতিবাসীরা অনেক সময় তাহার অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া উঠিত, কিন্তু প্রবীণ ডাক্তার মৈত্রকে সকলেই একটু সমীহ করিত বলিয়া, মোহিতের অত্যাচার নীরবে সহিয়া যাইত। মোহিত যখন কৈশোর ছাড়িয়া যৌবনে পদার্পণ করিল, তখনও তাহার স্বভাবের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। ডাঃ মৈত্রের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহারই স্থান অধিকার করিয়া বসে, সেজন্য তিনি চেষ্টার ক্রটীও করেন নাই। কিন্তু মোহিত কোন দিনই চিকিৎসাশাস্ত্রের জটীল বইগুলার মধ্যে মনোনিবেশ করিতে পারিত না, তার চেয়ে সাঁতারুদের দলে যোগ দিয়া গঙ্গাপার হওয়া বা বনজঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়ানো, তাহার নিকট সহজ কাজ বলিয়া মনে হইত। মোহিত কোনরকমে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হইল বটে, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য বিশেষ কিছুই আয়ত্ব করিতে পারিল না।

দাদার চেয়ে ছোট বোন অনিন্দিতা বরং সরস্বতীর অধিকতর অনুরাগিণী ছিল। ডাক্তার মৈত্র একটু সাহেবী চালে চলিলেও, পত্নী শ্যামমোহিনীর সেকেলে সংস্কার দূর হয় নাই। সেজন্য মেয়েকে 'খৃষ্টানী কলেজে' পাঠাইতে তাঁহার তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু 'আধুনিক কালের' বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধে শেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইয়াছিল।

করুণাময় বাবু কোন একটা সরকারী উচ্চপদ হইতে অবসর লইয়া ১০।১২ বৎসর হইল মোহিতদের প্রতিবাসীরূপে বাস করিতেছিলেন।

প্রতিমাকে মোহিত ক্ষুদ্র বালিকারূপে দেখিয়াছে, তাহাকে লইয়া কত খেলাধূলা, রঙ্গরহস্য করিয়াছে। আর সেই প্রতিমা এখন ছোটখাট একজন 'মহিলা' হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি মোহিতের সঙ্গে বড় বড় বিষয়ে তর্ক করিতেও সে সাহস করে! তর্কের সময়কার প্রতিমার সেই গম্ভীর মুখ, বিষাদ ম্লান করুণ চক্ষু মনে পড়িয়া মোহিতের বেশ কৌতুক বোধ হইতেছিল।

করুণাময় বাবু প্রতিমাকে কোন স্কুল কলেজে পাঠান নাই। আধুনিক স্কুল কলেজে মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা হয় না বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি গৃহেই শিক্ষক রাখিয়া নিজের আদর্শে মেয়েকে সুশিক্ষিতা, করিয়াছিলেন, নিজেও অনেক সময়ে মেয়েকে পড়াইতেন।

(২)

মোহিত তাহার লম্বা কোটটা গায়ে চড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় শ্যামমোহিনী আসিয়া একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলিলেন—

"এত সকালে কোথায় বেরুচ্ছ? কলেজের সঙ্গে তো অনেককাল সম্পর্ক ছেড়ে দিয়েছ; আগে ছিল খেলার বাতিক, এখন যে কোন নূতন বাতিক ঘাড়ে চেপেছে, তা জানিনে। আমি বুড়ো মানুষ, আর কতকাল এই ভাবে তোমাদের আগলে থাকবো? শেষ বয়সে কোথায় ভগবানের নাম করবো,—না, তোমাদের দুই ভাই বোনের চিন্তায় রাত্রে আমার ঘুম হয় না।

মোহিত মাতার ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া অপরাধীর মতো মাথা নত করিল, ধীরে ধীরে বলিল—

"তাই একটা কাজকর্ম খুঁজছি, মা। কিন্তু আজকাল বাজার যেমন, তাতো জানই—" বলিয়া মোহিত ঢোক গিলিল।

শ্যামমোহিনী কণ্ঠের সুর আর একটু চড়াইয়া বলিলেন,—"কাজকর্ম্ম যে কতই খুঁজছ, তার ঠিকঠিকানা নাই। সহরে কত ডিসপেন্সারী আছে, তার কোন একটাতে বস্‌বার বন্দোবস্ত করলেও তো পার! এতবড় ছেলে হলে, কোথায় সংসার ধর্ম্ম গুছিয়ে আমাকে রেহাই দেবে, না বুড়ো মার উপরেই যত বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছ। সেদিন প্রতিমার মা কত দুঃখ করে বললেন,—'তোমার মোহিতের মত অমন ছেলে, ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে এনে কোথায় একটু জিরুবে, আমোদ আহ্লাদ করবে, দিদি,—তা না,—"

বলিতে বলিতে শ্যামমোহিনীর কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল, তিনি অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। মোহিত হতবুদ্ধির মতো চাহিয়া রহিল।

—"বৌ ঘরে এনে আমোদ আহ্লাদ করবো, সে আশা আর আমি করিনে। তবে মেয়েটার তো একটা গতি করতে হবে। এতবড় আইবুড়ো মেয়ে, লোকে কত নিন্দে করছে। তুমি ভাই হয়ে যে তার বিয়ের জন্য একটু চেষ্টা চরিত্তির করবে, তা তোমার দ্বারা হবে না। আজ যদি তিনি থাকতেন—"

পরলোকগত স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া শ্যামমোহিনী অশ্রুরোধ করিতে পারিলেন না। মোহিত মায়ের এমন ব্যাকুলতা কোনদিন দেখে নাই। তিনি স্বভাবতঃই সংযত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন, এমন কি স্বামীর মৃত্যুতেও তিনি শোকোচ্ছ্বাসে বিহ্বল হইয়া পড়েন নাই। আজ সেই স্বল্পভাষী চিরসহিষ্ণু মায়ের মুখে এই সব কথা শুনিয়া মোহিত বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার মনে কত বড় দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ হইয়াছে।

মোহিত ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিল—"আচ্ছা মা, তোমাকে কথা দিলুম যে আজ থেকেই অনির জন্যে বরের সন্ধান করবো। ওর মত মেয়ের জন্য বরের ভাবনা কি? কিন্তু মা তোমার অনি যে বিয়ে করতে চায় না—"

শ্যামমোহিনী তীব্র দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "যত সব অনাছিষ্টি কথা! কলেজে পড়ে মেয়ের বুঝি এই সব বিদ্যে হচ্ছে! আমি তখনই বলেছিলুম, হিঁদুর ঘরের মেয়েকে খৃষ্টানী কলেজে দিও না, কিন্তু আমার কথা কে শোনে! মেয়ে এখন চিরকাল আইবুড়ো হয়ে থাকুন, আর আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠী, সকলে মিলে আমাকে ধিক্কার দিক, এই না তোমাদের ইচ্ছা?"

মোহিত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, আমার তা মোটেই ইচ্ছা নয়, তুমি যাতে সুখী হও, আমি তাই করবো, আমি অনিকে বুঝিয়ে বলবো।"

"সে আমি দেখবো। তুমি যেটুকু পারবে, তাই কর। দশজন আত্মীয়স্বজন মুরুব্বীর সঙ্গে পরামর্শ করে, একটা ঠিক করে ফেলো। পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু ছেলে হলে তো চল্‌বে না, আর তারা কলেজে পড়া মেয়ে বিয়ে করতেই বা চাইবে কেন।"

মোহিত হাসিয়া বলিল—"তোমাকে অত ভাবতে হবে না, মা। অনির জন্যে অনেক বিলাত ফেরত ভাল ছেলেই মিলবে। কিন্তু মা, আমার ওই বিলাত ফেরত গুলোকে পছন্দ হয় না; ওরা বিজাতীয় শিক্ষা পেয়ে কেমন যেন কিম্ভূত কিমাকার হয়ে আসে।"

শ্যামমোহিনী মোহিতের শেষ কথা-গুলিতে তেমন কাণ দিলেন না। বলিলেন—"সে যা হয় কর। আসছে অঘ্রাণের মধ্যে আমি অনির সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চাই। মায়ের যে জ্বালা, তোমরা তার কি বুঝবে!"

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিত চিন্তিতভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতেছিল। তাহার মনের মধ্যে আজ ঘোর সংগ্রাম বাধিয়াছে। একদিকে সংসার,—অন্যদিকে দেশ, কাহার সেবায় সে আত্মসমর্পণ করিবে? কাহারও দাবী তো তাহার উপর কম নহে। তাহাদের এই ক্ষুদ্র সংসারের দায়িত্ব একমাত্র তাহারই; —বৃদ্ধা মাতা, অনূঢ়া ভগ্নী, তাহাদের একমাত্র বলভরসা সে। তাহার পিতা কিছু বিত্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বসিয়া খাইলে তাহাতে কয়দিন চলিবে? সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী তাহার স্নেহময়ী মা মুখ ফুটিয়া কিছু বলেন না, অভাব অনটনের কথা সে বড় একটা জানিতে পারে না; কিন্তু সে বেশ বুঝিতে পারে, তাহাদের সংসারে অর্থাভাব ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। অথচ সে এক কপর্দ্দকও উপার্জ্জন করে না। সমাজের সমস্ত নিন্দা গ্লানি সহ্য করিয়া অনিন্দিতাকেই বা আর কতদিন ঘরে রাখিতে পারা যায়? মোহিত এই সব দিকে মন দিবে,—না, যে মহান্ আহ্বান তাহার হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার নিকটেই আত্মসমর্পণ করিবে? সে আহ্বান যে সর্ব্বগ্রাসী! মোহিতের তরুণ মন ভাবিয়া কোন কূল কিনারা পাইতেছিল না।

"দাদা তুমি আমাকে ডেকেছিলে"—বলিতে বলিতে অনিন্দিতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

"কে, অনি,—আয়, তুই আজ কলেজে যাস্‌নি?"

"মা বল্‌লে তোর আর কলেজে গিয়ে কাজ নেই—" অনিন্দিতার কণ্ঠস্বরে ব্যথা ও অভিমান স্পষ্ট প্রকাশ পাইল।

মোহিত স্নিগ্ধস্বরে বলিল—"মার উপরে রাগ করিস্‌নে, অনি। মা হয়ত সব দিক ভেবে ভালোর জন্যই বলেছেন—"

অনিন্দিতা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তারপর কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"দাদা, একি তোমাদের অত্যাচার, মেয়েদের কি ইচ্ছামত লেখাপড়া শেখবারও অধিকার নেই? মেয়েদের ভালোর জন্যই তো তোমরা সব কর,—কিন্তু যাদের ভালো করতে চাও, তাদের মতামতের কি কোন মূল্য নেই?—"

"তোকে তর্কে হারাতে পারে, এত বিদ্যে তোর দাদার নেই। কিন্তু ভেবে দ্যাখ, সমাজের দশজনের কথাও তো মেনে চল্‌তে হয়। আমাদের এই হিন্দু সমাজের যে সব নিয়ম, তাতো আর চট করে উল্‌টে দেওয়া যায় না। তুই বুদ্ধিমতী, সবই বুঝতে পারছিস,—একদিন তো তোকে শ্বশুর ঘরে যেতেই হবে।"

"অর্থাৎ মা ও তুমি যত শীঘ্র পার, আমাকে বিদায় করে দিতে চাও?"—অভিমানে অনিন্দিতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে সে কতকটা আত্মসংবরণ করিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল—

"আমি তো তোমাকে বলেছি দাদা, আমি চিরকুমারী থাকবো। তুমি হিন্দুসমাজের বাধার কথা বলছো, কিন্তু হিন্দুসমাজ যখন জীবন্ত ছিল, তখন অনেক মেয়ে চিরকুমারী ব্রহ্মচারিণী হয়ে বিদ্যাচর্চ্চা করতেন। আর এ কালেই বা সেটা অ-হিন্দু প্রথা বলে গণ্য হবে কেন?"

মোহিত কোন উত্তর দিল না। অনিন্দিতা একটু থামিয়া বলিতে লাগিল—"সব মেয়েকেই একই ছাঁচে ফেলে গড়তে হবে, এ বর্ব্বর প্রথা আমি মেনে চল্‌তে পারবো না। মা ও তুমি যদি আমাকে ভার মনে কর—"

মোহিত এবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—"অনি, তুই বড় বেশী নার্ভাস হয়ে পড়েছিস। লেখাপড়া শিখেছিস, তোকে তো আর

তোর অমতে জোর করে আমরা বিয়ে দিচ্ছিনে। কিন্তু মার উপরেও তোর একটা কর্ত্তব্য আছে। তোর বিয়ে না হলে, মা কিছুতেই মনে শান্তি পাবেন না।"

"কর্ত্তব্য কেবল আমার নয়, তোমারও তো আছে, দাদা। তুমিই না হয় একটী রাঙ্গা বৌ ঘরে আন, মা বেশ খুসী হবেন।"

মোহিত হাসিয়া বলিল—"রাঙ্গা বৌএর জন্য কৃষ্ণনগরের কারিগরদের কাছে ফরমাইস দিয়েছি।"

অনিন্দিতা দাদার কথা ও মুখভঙ্গীতে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল, তারপর ঈষৎ বিষণ্ণভাবে মোহিত বলিল,—"তোর দাদার যে যোগ্যতা, তাতে এ বাঙ্গলা দেশের কোন মেয়ে তাকে স্বামীরূপে পাবার জন্যে লালায়িত হবে, তার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।"

অনিন্দিতা হাসিয়া বলিল—"এ তোমার অন্যায় কথা, দাদা। বাঙ্গলা দেশে মেয়ের তো দুর্ভিক্ষ হয়নি, কেননা পঞ্চম পক্ষের বাহাত্তুরে বুড়োর জন্যও মেয়ের অভাব হয় না। তুমি যদি অর্দ্ধেক রাজত্ব রাজকন্যা চাও, তাতেও তোমার কেউ নিন্দা করবে না। এ হিন্দুসমাজে মেয়ের মূল্য কাণা কড়িও নয়।"

বাহিরে বৃক্ষপত্রের উপর সূর্য্যকর পড়িয়া ঝলমল করিতেছিল। কতক-গুলি চড়ুই পাখী নাচিয়া নাচিয়া বৃক্ষশাখার উপরে ক্রীড়া করিতেছিল। একটা কাক দূরে গম্ভীরভাবে বসিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল, বোধ হয় তাহাদের এই চাপল্য তাহার ভাল লাগিতেছিল না। মোহিত কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে খোলা জানালা দিয়া এই দৃশ্য দেখিল, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

"অনি, আমার কথা ছেড়ে দে। আমার মন এ ঘরের মধ্যে বাঁধা

থাকতে চায় না। আমি এমন একটা কিছু চাই, যা দুঃসাধ্য, দুর্ল্লভ, যার জন্য চির জীবন কঠোর সাধনা, প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করা যেতে পারে।”

“সে কি দাদা, তুমি যে একেবারে কবি হয়ে উঠলে? কিন্তু তোমার এ দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী বোঝবার সাধ্য আমার নাই।”

“—হেঁয়ালী নয় দিদি, সত্যিকার জীবনের অনুভূতি। লক্ষ লক্ষ লোক গড্ডলিকা প্রবাহের মত যে পথে চলছে, সে পথ সহজ তা জানি, কিন্তু সহজ বলেই সে পথে আমার মন যেতে চায় না। দুর্ল্লভের ধ্যানে যে আনন্দ, দুঃসাধ্যের সাধনায় যে শক্তির উত্তেজনা,—পরিপূর্ণ প্রাণের বেগ, আমার মন তারই জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।”

অনিন্দিতা বিস্মিতভাবে মোহিতের দিকে চাহিয়া রহিল। মোহিত অনিন্দিতার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—

“আশ্চর্য্য হচ্ছিস্ অনি, একটু আশ্চর্য্য হবার কথাই বটে! আমাদের এই পরাধীন দেশে, জীবন তার সঙ্কীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যে এমনই সীমাবদ্ধ যে, এর বাইরে কেউ দৃষ্টিপাত করলে আমরা শিউরে উঠি, সনাতন বাঁধা রাস্তা দিয়ে কেউ না গিয়ে, যদি কঙ্করময় বন পথ ধ’রে চলে, তবেই তাকে আমরা বিকৃত মস্তিষ্ক বলি। কিন্তু স্বাধীন দেশে, জীবন যেখানে প্রাণের বেগে পরিপূর্ণ, সেখানে তার নব নব বিচিত্র বিকাশ হয়। তাই তারা পদে পদে প্রাণ দিয়েও অমর, আর আমরা অতি সন্তর্পণে সিন্দুকের মধ্যে প্রাণকে পূরে রেখেও মৃত। এই জ্যান্তে মরার জাতি যদি পরাধীন না হবে, তবে হবে কারা? কিন্তু অনি, তুই কি বুঝিস্ পরাধীনতার বেদনা—জ্বালা? যদি কতকগুলো সৃষ্টিছাড়া বেপরোয়া লোকের মনে এই বেদনা প্রবল ভাবে জেগে ওঠে এবং তারা সর্ব্বস্ব পণ করেও এই দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙ্গতে চায়, তবে তাদের কি দোষ দেওয়া যায়?”

অনিন্দিতা অবাক্ হইয়া দাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—মোহিতের

শেষের কথাগুলিতে সে যেন চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল। মোহিত সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিল—

"আমার মনেও সময়ে সময়ে সেই দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা জেগে ওঠে, আর তখনই মনে হয়, আর যাই হোক, আমি আর কোন কৃষ্ণনগরের পুতুল নিয়ে খেলাঘর গড়ে তুল্‌তে পারবো না।"

"দাদা, তুমি কি করতে চাও, তা আমি জানিনে। কিন্তু সব মেয়েই কি কৃষ্ণনগরের পুতুল? ধর, আমাদের প্রতিমার মত মেয়ে, সে কি কেবল গ্লাসকেসে বা আলমারীতে সাজিয়ে রাখবার জন্য হয়েছে। এই সব মেয়ে পুরুষের গতি পথে, মহৎ লক্ষ্যের সাধনায় বাধা না হয়ে, সহায়ও তো হতে পারে।"

প্রতিমার নামে মোহিত যেন ঈষৎ চমকাইয়া উঠিল, তাহার স্বচ্ছ ললাটের উপরে এক মুহূর্ত্তের জন্য ঈষৎ ছায়া খেলিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ও সব কথা থাক অনি। এখন তোর কথা যা বলছিলাম, তার সম্বন্ধে মন স্থির কর দেখি।"

অনিন্দিতা তাহার অঞ্চলপ্রান্ত দক্ষিণ হস্ত দিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলিতে কিছুক্ষণ ধরিয়া জড়াইতে লাগিল, তারপর ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল,—

"দাদা, তুমি যদি বড় কাজ বা মহৎ আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পার, আমিই বা পারবো না কেন? অনেকদিন আমার মনে হয়েছে, আমাদের দেশের এই মেয়েদের দুর্গতির কথা। সমাজের নির্ম্মম যন্ত্রে তারা চিরদিন পিষ্ট হয়ে আস্‌ছে, অথচ তারা এতই অজ্ঞ যে, নিজেদের দুর্দ্দশা বোঝবার ক্ষমতাও তাদের নাই। আমার ইচ্ছা হয়, আমি দেশের এই বোনদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করি। আর দশজনের কাছে এটা হয়ত অদ্ভুত ব'লে মনে হবে, তারা নিশ্চয়ই নিন্দা করবে, কিন্তু তুমিও কি তাই করবে,

দাদা? তুমি যে পরাধীনতার বেদনার কথা বলছিলে, এও তো সেই বেদনা?"

মোহিত কিছুক্ষণ নীরবে ভাবিতে লাগিল। তার পর বিষণ্ণদৃষ্টিতে অনিন্দিতার দিকে চাহিয়া বলিল,—"এ যে বড় কঠিন কথা, অনি। আমার পক্ষে যা সম্ভব, তোর পক্ষে তা সম্ভব নাও হতে পারে। তাছাড়া, এই কথা শুনে মার মনে কতই না বেদনা হবে! তাঁকে আমি কি বলে বোঝাব?"

অনিন্দিতা কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল। মোহিত তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"আজ এসব কথা থাক, দিদি; এখনি আমাকে বেরুতে হবে। ফিরতে যদি রাত হয়, তোরা আমার জন্য বসে থাকিস্ নে।"

"কেন, রাত্রে তোমার কোথায় এমন দরকার? মা যে অত্যন্ত ব্যস্ত হবেন!"

"মাকে বলিস্, কোন ভয়ের কথা নেই,"—বলিয়া মোহিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোহিতের ঘরে বসিয়া মোহিত ও তাহার বন্ধু নরেশ কথা বলিতেছিল। নরেশের বয়স ২৭।২৮ বৎসরের বেশী নহে ; কিন্তু ললাটের চিন্তারেখা এবং বিষণ্ণ গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া তাহাকে বয়সের তুলনায় একটু প্রবীণ বলিয়াই মনে হইত। তাহার দিকে চাহিলে প্রথমেই চোখে পড়িত তাহার অস্বাভাবিক গায়ের রং। এ রং ঠিক গৌরবর্ণ নহে, পাণ্ডুর বর্ণ বা ফ্যাকাশে রংএর যাহা চরম সীমা বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে, এ তাহাই। যেন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিধাতা তাহার দেহের সমস্ত রক্ত আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই অস্বাভাবিক পাণ্ডুবর্ণ নরেশের সমস্ত শ্রীকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল। নরেশের মুখের একটা পরুষভাব এবং দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধর দেখিলে মনে হইত, সে অত্যন্ত জেদী ও দুঃসাহসী লোক। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা ক্রূরতা লুক্কায়িত ছিল, যাহাতে বুঝা যাইত যে, এ লোক প্রয়োজন হইলে ঘোর প্রতিহিংসা পরায়ণও হইতে পারে। লোমশ ভ্রূযুগ এবং ঈষৎ স্থূল ওষ্ঠাধর, তাহার মধ্যে সুপ্ত কামনার অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিত।

মোহিত ক্ষণকাল চিন্তিতভাবে নরেশের দিকে চাহিয়া বলিল,

"আমার উপর কি নূতন আদেশ হয়েছে, তুমি কি সংবাদ বাহক ?"

নরেশ কোন কথা না বলিয়া বুকের একটা গোপন স্থান হইতে একখানি লাল রংএর কাগজ বাহির করিয়া মোহিতের হাতে দিল। কাগজে কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য চিত্রলিপি অঙ্কিত ছিল।

মোহিত সেই সাঙ্কেতিক চিত্রলিপি পাঠ করিয়া নরেশের দিকে মুখ না

তুলিয়া যেন আপন মনেই বলিল—"কিন্তু বড়ই কঠিন কাজ—এ কি করতে পারবো ?"

নরেশ ঈষৎ ক্রুর ভাবে হাসিয়া বলিল—"সে বিচার করবার অধিকার তো তোমার নাই বন্ধু,—তুমি কেবল আদেশ পালন করবে। তবে আমি যতদূর জানি, তোমার শক্তি ও ক্ষমতার উপরে সকলেরই খুব বিশ্বাস। হাঁ—আর—একটা কথা—,"

নরেশ মোহিতের কাণের কাছে মুখ লইয়া মৃদুস্বরে কি বলিল।

মূহূর্ত্তে মোহিতের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে বজ্রাহতের মত কিছুক্ষণ মুহ্যমান হইয়া রহিল। নরেশ তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, যেন সে মোহিতের এই মনের অবস্থা বেশ উপভোগ করিতেছিল। তার পর মোহিতের স্কন্ধে এক হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে স্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া বলিল—

"এবার কঠিন পরীক্ষা সুরু হয়েছে, গোড়াতেই বিচলিত হয়োনা, বন্ধু। এখন তবে—"

নরেশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল, একহস্তে জলের গেলাস, অন্য হস্তে একটা রেকাবীতে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া অনিন্দিতা গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, 'দাদা'! কিন্তু পরিক্ষণেই একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সেই কক্ষে দেখিয়া সে থতমত খাইয়া গেল ; গৃহের ভিতরে আর অগ্রসর হইতেও সে ইতস্ততঃ করিতেছিল, ফিরিয়া যাইতেও কুণ্ঠাবোধ হইতেছিল। এই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় পড়িয়া তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল।

নরেশ দেখিল, তাহার সম্মুখে মূর্ত্তিমতী অগ্নিশিখা। সমুদ্র মন্থনের পরে একহস্তে সুধাপাত্র, অন্য হস্তে বিষভাণ্ড লইয়া লক্ষ্মী যখন প্রথম আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তখনও বোধ হয় তাঁহার এমনি শোভা হইয়াছিল।

অনিন্দিতার ললাট লজ্জায় ঈষৎ রক্তিম, আয়ত চক্ষুর্দ্বয় অবনত ; কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে অপাঙ্গে সে যে মোহিতের দিকে চাহিয়াছিল, তাহা যেন শাণিত তীরের মতো নরেশের হৃদয় ভেদ করিয়াছিল। কেশ অ-বেণী সংবদ্ধ, বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া সর্পশিশুর ন্যায় পৃষ্ঠে ক্রীড়া করিতেছিল। অনিন্দিতার অঙ্গ জড়াইয়া একখানি গৈরিক রঙের শাড়ী, তাহার উজ্জ্বল বর্ণকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। আত্মসংযমের সহস্র চেষ্টা-সত্ত্বেও, নরেশের মন কেমন যেন বাঁধভাঙ্গা নদীর ন্যায় সেই তরুণীর পায়ে লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল। নরেশ আরও অনেক কিশোরী ও তরুণীকে দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার চিত্ত তো এমন বিভ্রান্ত হইয়া উঠে নাই। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নরেশ কি করিবে ভাবিতেছিল, এমন সময়ে অনিন্দিতার দিকে চাহিয়া মোহিত বলিল,—

"অনি, ইনি নরেশ, আমার বন্ধু, এঁকে দেখে লজ্জা করা চলবে না।" নরেশের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমার ছোট বোন অনিন্দিতা। ওর জ্বালায় আমার দুদণ্ড স্থির হয়ে থাকবার জো নেই। এই দেখ না, সকাল বেলাই বসে বসে আমার জন্য প্রচুর জলযোগের আয়োজন করেছে—" বলিয়া মোহিত হাসিতে লাগিল।

নরেশ যেন কিছু একটা বলিবার কথা পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

"তোমার কোন ভয় নাই, মোহিত। তুমি যদি একা এই গুরুভার বহন করতে অক্ষম হও, তবে তার কিছু অংশ এই ক্ষুধার্ত্ত অতিথিও বহন করতে প্রস্তুত আছেন। নিয়ে আসুন এদিকে—"

নরেশ খুব সহজ ও লঘুভাবেই কথাগুলি বলিতে চাহিল, কিন্তু তবু তাহার কণ্ঠ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, স্বর জড়াইয়া গেল।

মোহিত নরেশের কথায় উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—"অনিকে তুমি যে

মস্ত বড় একজন লেডী ঠাউরে, খুব সম্মানের সঙ্গে কথা বল্‌ছ! অনি, আমার ক্ষিদে নাই রে, খাবারগুলো নরেশকেই দে।”

অনিন্দিতা টেবিলের উপরে নরেশের সম্মুখে মিষ্টান্নের রেকাবী ও জলের গেলাস রাখিয়া দিয়া, মোহিতের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল,

“তোমার জন্যও নিয়ে আসি, দাদা।”

“আরে না না পাগলী, বললুম আমার ক্ষিদে নাই!”

অনিন্দিতা অভিমান ও অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টিতে মোহিতের দিকে চাহিল, নরেশের সম্মুখে সঙ্কোচে আর কিছু বলিতে পারিল না।

নরেশ ব্যাপার বুঝিয়া মোহিতের দিকে চাহিয়া বলিল—“তুমি এর থেকেই নাও না, মোহিত। তুমি না খেলে উনি মনে ব্যথা পাবেন। এ তো তোমারই প্রাপ্য জিনিষ, আমি জোর করে এই অমৃতে ভাগ বসিয়েছি বইত নয়—”

বলিয়া অনিন্দিতার দিকে চাহিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে হাঁসিল।

সে চাহনীতে কি ছিল জানিনা, কিন্তু অনিন্দিতা সে চাহনীর সম্মুখে দৃষ্টি নত করিল। তারপর মোহিতের দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে বলিল—“উনি যে খেয়েছেন, এই আমাদের সৌভাগ্য, কিন্তু এই সামান্য জিনিষ ওঁর সামনে দিয়ে আমারই লজ্জা হচ্ছে।”

“শুন্‌লে নরেশ, অনি জানে কেমন করে অতিথির সৎকার করতে হয়।” বলিয়া মোহিত হাসিতে লাগিল।

নরেশ ততক্ষণে একটা সন্দেশ মুখের মধ্যে পূরিয়া বলিল—“অনেকদিন এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে এমন সুখাদ্য জোটে নাই, আর সুদূর ভবিষ্যতে যে জুটবে, তারও কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে উনি যে লোভ দেখালেন, মাঝে মাঝে আমাকে আসতেই হবে।”

মোহিত অনিন্দিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—“তা হ’লে এই অন্যায়

লোভ দেখানোর জন্য, অনি দিদি, তোমাকে একদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বেশ ভাল করে তোমার হাতের রান্না খাইয়ে নরেশকে তাক লাগিয়ে দাও।"

অনিন্দিতা দাদার কথায় লজ্জিতভাবে হাসিয়া ঘাড় নাড়িল; তার পর, "যাই, তোমার জন্য জল আনিগে", বলিয়া ঘর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। নরেশ একদৃষ্টে সেই তরুণীর গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মনে হইল যেন একটা জ্যোতিঃরেখা তাহার চোখের সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

নরেশ সাগ্রহে অনিন্দিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে যে মোহিতের জন্য জল লইয়া আসিল, সে অনিন্দিতা নয়, ভৃত্য শ্রীমন্ত। নরেশ একটু হতাশ হইয়াই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নরেশ যখন মোহিতদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন একটা আনন্দের নেশায় তাহার মন বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। আজ যেন সে কি একটা নূতন জিনিষ পাইয়াছে, তাহার হৃদয়ের অতি নিভৃত গুপ্ত কক্ষের দ্বার কে যেন খুলিয়া দিয়াছে। সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না, এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের উৎস কোথায়, কিন্তু তাহার সমস্ত হৃদয় মন তাহারই সুরে পূর্ণ হইয়া উঠিল। চারিদিককার লোক জন, গাড়ী ঘোড়া, পথপার্শ্বের পবনান্দোলিত বৃক্ষশাখাবলী, রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রান্তর, দিগ্বলয়—আজ এ কি এক নূতন শোভায় মণ্ডিত! ধরণী তো তাহার নিকট কোন দিন এত শোভাময় বোধ হয় নাই, সূর্য্যকর তো এমন মধুর লাগে নাই। পথযাত্রী অপরিচিত পথিকের মুখও তো এমন কৌতুকপূর্ণ হাস্যময় সে পূর্ব্বে কোন দিন দেখে নাই। সে আপনার অন্তরের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, সেখানে একটা অভিষেকোৎসব লাগিয়া গিয়াছে, কোন সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী যেন আজ তাহার হৃদয় শতদলের উপর রক্তকমল লাঞ্ছিত রাঙ্গা চরণ স্থাপন করিয়াছে। তাহার কপোল লাজ রক্ত, উজ্জ্বল চক্ষুতে ব্রীড়া কুঞ্চিত অথচ মর্ম্মভেদী দৃষ্টি, অলকদাম স্কন্ধে, পৃষ্ঠে, ললাটে ঈষৎ নাচিয়া নাচিয়া ক্রীড়া করিতেছে, অধরে সলজ্জমধুর হাস্য ;—এ মূর্ত্তি কোন অবসরে নরেশের চিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছে ? সে নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়িয়া কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

নরেশ এই অভিনব চিন্তায় তন্ময় হইয়া পথ চলিতেছিল, তাই তাহার অভ্যস্ত তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি লক্ষ্য করিল না যে, একজন ভদ্রবেশী

বাঙ্গালী দূর হইতে তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল। অন্য সময় হইলে সে হয়ত একটা বাঁকা পথে ঘুরিয়া তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু এখন সে কোনরূপ সাবধানতাই অবলম্বন করিল না, অন্যমনস্কভাবে সোজা পথেই চলিতে লাগিল।

জেলেটোলার অন্ধকার গলির মধ্যে একটা পুরাতন জীর্ণ বাড়ী। কলিকাতা সহরের ঐশ্বর্য্য বিলাস জাঁক জমকের মধ্যে, তাহার কেন্দ্রস্থলে, এমন স্থান যে থাকিতে পারে, তাহা সহসা কেহ কল্পনা করিতে পারে না। সূর্য্য ও পবনদেব উভয়েরই এখানে গতায়াত নিষিদ্ধ। নরেশ যখন অতি সন্তর্পণে সেই সরু গলি পার হইয়া সঙ্কীর্ণ দরজা ঠেলিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন ৫।৭ জন যুবক নীচে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল। তাহারা সকলে একসঙ্গে 'নরেশদা, নরেশদা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নরেশ প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হাসিল, তার পর একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"কি হে মহেন্দ্র—আজ কি হচ্ছে ?"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"আজও পবিত্র হরিবাসর ব্রত পালন করবার যোগাড় হচ্ছে, দাদা। আর কতদিন এভাবে চলবে বুঝতে পারছি নে।"

নরেশের মনে হইল, সে তো নিজে মোহিতের বাড়ী হইতে, দুইদিন পরে কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ইহারা এখনও অনাহারে। নরেশ মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইয়াই উঠিল। সে ধীরে ধীরে ম্লান মুখে আর কাহারও দিকে না চাহিয়া এক কোণের একটা ঘরে প্রবেশ করিল।

অপ্রশস্ত একটী কক্ষ, স্যাঁৎসেঁতে মেজে, আলো বাতাস প্রবেশের পথ নাই বলিলেই চলে। সেই স্যাঁৎসেঁতে মেজের উপরে পাঁচ সাতটী মাদুর পাড়া আছে। এইগুলিই এখানকার অধিবাসীদের শয্যা, বসিবার

আসন, বিশ্রামের স্থান,—যা কিছু সবই। নরেশ জুতা খুলিয়া ক্লান্তভাবে তাহারই একখানি মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল।

মহেন্দ্র আসিয়া বলিল—"নরেশদা, আগে ভাব্‌তাম যে, মানুষের মনই সব চেয়ে বড়, তার দুর্জ্জয় শক্তি কেউ রোধ করতে পারে না, সকল বাধা বিঘ্নকে সে অগ্রাহ্য করতে পারে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, দেহকে অতিক্রম করা সোজা নয়, অন্ততঃ তারও একটা সীমা আছে।"

নরেশ কোন উত্তর দিল না, সে যে মহেন্দ্রের কথা শুনিতে পাইয়াছে, এরূপ ভাবও প্রকাশ করিল না।

মহেন্দ্র বলিতে লাগিল—"আমরা চাই মুক্তির সংগ্রাম করতে, কিন্তু জনকয়েক দরিদ্র, অনাহারক্লিষ্ট, ভবঘুরে, লক্ষ্মীছাড়া লোক,—এরা কি এমন একটা বিরাট সংগ্রাম চালাতে পারে? রামায়ণে লেখা আছে বটে যে, কাঠবিড়ালীও সমুদ্রবন্ধনে সাহায্য করেছিল; কিন্তু সে ত্রেতা যুগের কথা, এই কলিকালে সেটা সম্ভব নয়। কেন এদেশে কি ধনী মানী, ঐশ্বর্য্যশালীদের অভাব আছে, এদের শক্তির কি কেবল অপব্যয়ই হবে?"

নরেশ মহেন্দ্রের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল, তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল,—"তুমি এই ধনীদের উপর বড় বেশী অবিচার করছো, মহেন্দ্র। সবদেশেই ধনীমানীরা অল্পবিস্তর এই রকমই। যখন যেখানে অতিরিক্ত মাত্রায়, প্রায় বিনা আয়াসে ধন সঞ্চিত হয়ে ওঠে, সেখানে তা পচে আবর্জ্জনার মত দুর্গন্ধময় হবেই। তার উপর এই পরাধীন দেশের ধনীর দল, এরা তো জড়ধর্ম্মী। নিজের ইচ্ছায় এরা কিছু করতে পারে না, এদের দিয়ে জোর করে যদি কেউ কিছু করিয়ে নিতে পারে, তবে হয়ত কিছু হয়।"

নরেশের অধর কোণে বিদ্রূপের বক্র হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—

"কিন্তু আমি ভাবছি, মহেন্দ্র, ওই মুষ্টিমেয় ধনীদের কথা নয়; লক্ষ লক্ষ নির্য্যাতিত, অনাহার-ক্লিষ্ট কঙ্কালসার দেশবাসীর কথা। তারা একবেলা পেট ভরে দু মুঠো খেতে পায় না। রোগে বিনা চিকিৎসায় নিতান্ত অসহায় ভাবে মরে। আমরা দুদিন অনাহারে থেকেই দেশের ধনীদের উপর অভিমান করছি, কিন্তু এই যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যহ অনাহারের বিভীষিকা চোখের সামনে দেখ্ছে, স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে বেঁচে থেকেও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে, এদের কথা কি কখনও আমরা ভাবি? অথচ এরাই তো দেশ, এদের জন্যই তো স্বাধীনতা বল, মুক্তি বল, সব!"

মহেন্দ্র ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিল,—"তা ঠিক, কিন্তু এরাই কি কোন দিন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে বা দেশকে স্বাধীন রাখবার চেষ্টা করেছে? সুলতান মামুদ যখন হিন্দুকুশের পর্ব্বত প্রাচীর পার হ'য়ে, সিন্ধুর মরুভূমি অতিক্রম ক'রে, অষ্টাদশ বার ভারত লুণ্ঠন করেছিল; এদেশের মন্দির ভেঙ্গে, দেবমূর্ত্তি চূর্ণ ক'রে, গ্রাম নগর ধ্বংস ক'রে, হিন্দুনারীকে অপহরণ ক'রে, গাড়ী বোঝাই করে ধনরত্ন দেশে নিয়ে গিয়েছিল, তখন তোমার এই "দরিদ্র জন সাধারণ" কি বাধা দিয়েছিল? বক্তিয়ার খিলিজী যখন বাঙ্গলা জয় করেছিল, তখন এরা কোথায় ছিল? পাণিপথের প্রাঙ্গণে, পলাশীর আমবাগানে—কই এরা ত জীবন পণ করে স্বাধীনতারক্ষা করে নি? একদিকে পাঠান ও মোগলদের শাসন এরা যেমন বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে ছিল, অন্যদিকে বর্গী দস্যুদের বর্ব্বরতার সামনেও তেমনি সহজে মাথা নীচু করেছিল। এই যে লক্ষ লক্ষ অমানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নীরবে বিনা প্রতিবাদে পরের পাদুকা বহন করছে, এরাই বা কি?"

নরেশ হাসিয়া বলিল,—"আমরা যা করে রেখেছি তাই! এদের কোন দিন আমরা মানুষ বলে মনে করিনি, দেশ কাকে বলে, স্বাধীনতা কাকে বলে, তা শেখাই নি। এরাও তেমনি শিখেছে; দেশ যার হাতেই থাক,

তাদের ক্ষতি কি ? গ্রীক মেগাস্থিনিস তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছিলেন, 'ভারতবাসীরা আশ্চর্য্য লোক। সে দেশে এমনও দেখা যায়, বহিঃশত্রুর সঙ্গে দেশের রাজার যুদ্ধ হচ্ছে, অথচ সেই যুদ্ধক্ষেত্রেরই অপর পার্শ্বে চাষীরা নীরবে প্রশান্তভাবে চাষ করছে !' এটা আবার আমরা খুব ঘটা করে পূর্ব্ব-পুরুষদের আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম মহিমা বলে প্রচার করি। কিন্তু জাতির এত বড় লজ্জার কথা, কলঙ্কের কথা আমি তো আর দেখিনে। ভারতবর্ষ কেন পরাধীন হয়েছে, তার কারণ ওর মধ্যেই স্পষ্ট লেখা আছে।"

"তুমি তো বড় হেঁয়ালীর মধ্যে ফেললে, দাদা। দেশের ধনীরাও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবে না, দরিদ্রেরাও তার কোন মর্ম্ম বুঝে না, তবে এই ভূতের শ্রাদ্ধ করবে কে ?"

নরেশ অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল,—"করবে যাদের দায় পড়েছে, যারা ডাক শুনেছে, তোমার আমার মত বেপরোয়া, লক্ষ্মীছাড়া, ভবঘুরের দল। এই ইতিহাসের চিরন্তন নীতি।"

একজন যুবক ঘরের ভিতর আসিয়া মহেন্দ্রের কাণে কাণে নিম্নস্বরে বলিল, "দেখতো মহেন্দ্র দা, একটা লোক গলির মধ্যে আমাদেরই দরজার কাছে ঘোরাফেরা করছে। লোকটার উপর আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।"

মহেন্দ্র তর্ক বন্ধ করিয়া আগন্তুক যুবকের অনুসরণ করিল, নরেশ কিন্তু শয্যা ছাড়িয়া উঠিল না।

( ২ )

নরেশ নির্জ্জন ঘরে শুইয়া আকাশ পাতাল নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিল। কয়েকদিন হইল কর্ম্মের পর কর্ম্মের তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে শ্রান্তক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে, অন্য কোন চিন্তা করিবার, এমন কি নিঃশ্বাস ফেলিবার পর্য্যন্ত তাহার অবসর ছিল না। আজ সুযোগ পাইয়া যত

রাজ্যের চিন্তা ও উদ্বেগ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের কল্পনা তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল।

সে স্বাধীনতা পথের যাত্রী, মুক্তি সংগ্রামের সৈনিক। কিন্তু কিসের জন্য, কাহার জন্য সে এই মুক্তি—স্বাধীনতা চায়? ঐ অলস জড় পদার্থ ধনী, লক্ষ লক্ষ অমানুষদের জন্য? তাহার সমস্ত জীবন এইজন্যই সে উৎসর্গ করিবে? ইহাতে কি তাহার সুখ, কি তাহার সফলতা? তাহার মনে পড়িল, বাল্যের কথা, প্রথম যৌবনের কথা। পিতার একমাত্র পুত্র, আশা ও আনন্দের আলোক ছিল সে; কত সুখে, কত আদরেই না সে পালিত হইয়াছিল! মনে পড়িল, শৈশবের সেই সুখময়, স্নেহময় গৃহ, ক্রীড়া-সঙ্গীদের কলহাস্যে মুখর, ছোট বোনদের চাঞ্চল্যে জীবনময়। প্রথম যৌবনে মেধাবী ছাত্র বলিয়াও তাহার খ্যাতি ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি গণ্ডী সে অনায়াসে ও গৌরবের সঙ্গে পার হইয়াছিল। তাহার পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবাসী বয়স্য সকলেই ভাবিত, নরেশ জীবনে একটা মস্তবড় কৃতীলোক হইবে। কিন্তু হায়, সে সুখের স্বপ্ন একদিনে ভাঙ্গিয়া গেল। একদিনে তাহার পিতামাতা দুশ্চিকিৎস্য বিসূচিকা রোগে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ছোট বোনেরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিল। তাহাদের শেষ মুহূর্ত্তেও সে দেখিতে পায় নাই, কেন না সে তখন কলিকাতায় বিদ্যার্ণবের একটা কঠিন পাড়ি জমাইবার চেষ্টা করিতেছিল। যখন সংবাদ পাইয়া সে তাহার সুদূর পল্লীতে ফিরিয়া গেল, তখন দেখিল সব শেষ, তাহার জীবনের সকল আনন্দদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তার পর অদৃষ্টসূত্র কোথায় তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল, কিরূপে ঘোর দারিদ্র্য, দুঃখ, বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের পত্র তাহাকে পথে বিপথে ঘুরাইতে লাগিল,—কেমন করিয়া সে লক্ষ্মীছাড়াদের দলে মিশিল, সে কাহিনী উপন্যাসের মতই অদ্ভুত।

জীবনের এই পরিণাম ভাল কি মন্দ, কে বলিবে? স্বদেশের স্বাধীনতাই তাহার একমাত্র কাম্য, তাহার নিজের কি কোন কামনা নাই? না, জীবনকে সে দেশের জন্যই উৎসর্গ করিয়াছে। তাহার নিজের বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, মোহিতও তো স্বাধীনতা পথের যাত্রী, অথচ কেমন সুখময় গৃহ, স্নেহময়ী মা, আর অমন আনন্দরূপিণী ছোট বোন। কিন্তু নরেশের কিছুই নাই, সে গৃহহারা সর্ব্বস্বহীন। তাহার যদি অতি ক্ষুদ্র একখানি কুটীরও থাকিত, আর অমনই একজন জ্যোতির্ম্ময়ী, আনন্দরূপিণী— ; না, না, এ সব দুশ্চিন্তা ভাল নয়। সে ব্রতী, দেশের জন্য চির কৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে। তাহার আবার এসব কামনা কেন? ছি, ছি, মোহিত তাহার এই মনের ভাব জানিতে পারিলে কি মনে করিবে!

নরেশ জোর করিয়া মন হইতে এই সব দুশ্চিন্তা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, তাড়াতাড়ি কাগজ পেন্সিল লইয়া একটা 'স্কীম' করিতে লাগিয়া গেল। কিন্তু ২।৩ ঘণ্টা চেষ্টার পরও জিনিষটা ঠিক মত জমিয়া উঠিল না। মনকে জোর করিয়া বাঁধিতে চাহিলেও, তাহার মন এই নীরস কাজের মধ্যে বাঁধা পড়িতে রাজী হইল না। কাহার উজ্জ্বল চক্ষু, গৈরিক রং এর শাড়ীর অঞ্চলপ্রান্ত, কপোল চুম্বিত চূর্ণ কুন্তল বার বার তাহার ধ্যানভঙ্গ করিতে লাগিল। নরেশ শেষে বিরক্ত হইয়া কাগজ পেন্সিল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

---

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আষাঢ়ের মধুর সন্ধ্যায় করুণাময় বাবুর বাড়ীতে প্রতিমার জন্মতিথি উৎসব বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। করুণাময় বাবুর বাহিরের বড় বৈঠকখানাটী ঠিক গঙ্গার ধারেই। অষ্টমীর চন্দ্র শুভ্র জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত করিয়াছিল, গঙ্গার তরঙ্গশীর্ষে সে জ্যোৎস্না নাচিয়া নাচিয়া চপল শিশুর মতই নৃত্য করিতেছিল।

হলঘরের একপাশে করুণাময় বাবু তাঁহার ২।৪ জন প্রবীণ বন্ধুদের লইয়া আদর আপ্যায়ন করিতেছিলেন। এবং মাঝে মাঝে প্রতিমাকে ডাকিয়া কোন পক্ক কেশ বিরল-দন্ত গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বৃদ্ধকে প্রণাম করাইয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছিলেন।

প্রতিমাকে আজ বড় মনোহর দেখাইতেছিল। তাহার পরিধানে চওড়া লালপাড়ের কাঁচাসোনার রংএর গরদের শাড়ী, স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণের সঙ্গে তাহা মানাইয়াছিল ভাল। প্রকোষ্ঠে স্বর্ণবলয়, কণ্ঠে সরু সোনার হার, মায়ের দেওয়া আশীর্ব্বাদের মতোই তাহার শ্রীকে যেন উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিল। ললাটে চন্দন রেখা, পৃষ্ঠবিলম্বিত এলায়িত কেশ, ব্রীড়া সঙ্কুচিত মধুর হাস্যের সঙ্গে মিশিয়া তাহাকে এক স্বর্গীয় শোভায় মণ্ডিত করিয়াছিল।

হলঘরের অন্য কোণে বসিয়াছিল তরুণীদের বৈঠক। অনিন্দিতা ও প্রতিমার আরও অনেক সমবয়স্কারা মিলিয়া সেখানে ভীড় জমাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের হাস্যপরিহাসে, লীলাকৌতুকরঙ্গে সেস্থান মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েকজন যুবকও কিশোরীদের সেই বিদ্যুদ্দীপ্ত

কটাক্ষ এবং তীক্ষ্ণ বিদ্রূপহাস্যের ভয়ে ভীত না হইয়া দুঃসাহসীর মতো সে আসবে যোগ দিয়াছিল।

সঙ্গিনীদের মধ্যে প্রতিমার সুকণ্ঠের বেশ খ্যাতি ছিল। তাই আজ সকলে মিলিয়া ধরিয়াছিল যে, প্রতিমাকেই গান গাহিয়া সন্ধ্যার সেই মিলনানন্দকে পূর্ণ করিতে হইবে। প্রতিমা কিছুতেই রাজী হইবে না; তাহার আপত্তির প্রধান কারণ এই যে, নিজের জন্মতিথি উৎসবে তাহাকেই গান গাহিবার অনুরোধ করা, অত্যন্ত অন্যায় ও অশোভন। দীপ্তি, অনিন্দিতা, সুচরিতা গান গাহিবে, আর প্রতিমা শুনিবে, এবং ভবিষ্যতে তাহাদের কাহারও জন্মতিথি উৎসবে প্রতিমা গায়িকার পদ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র আপত্তি করিবে না।

দীপ্তি চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "নে নে, ঢের ন্যাকামো হয়েছে, তুই কনে বউটি কি না যে গাইতে লজ্জা! আমার যখন জন্মতিথি হবে, তখন তোকে কিছুতেই গাইতে সাধবো না, এ আমি বলে রাখলুম—"

সুচরিতা কটাক্ষে বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া বলিল,—"তা নয়, ওর মনের কথা তোরা কেউ বুঝতে পারিস্ নি। ভাল গায়িকা বলে ওর যে নাম বেরিয়েছে, সেটা ও এত সস্তা দরে বিলিয়ে দিতে চায় না। তোমরা আর একটু সাধ,—আরও দর হাঁক—তবে তো—"

অনিন্দিতা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল—"এত লোকের অনুরোধ তুই যদি উপেক্ষা করিস্, তবে বুঝবো, তোর হৃদয় বলে কোন পদার্থ নেই—"

দীপ্তি বলিল—"আচ্ছা, আমাদের অনুরোধই না হয় না মানলি; কিন্তু ওই যে সুবোধ বাবু বসে আছেন, ওঁর কথাতো আর ঠেলে ফেলতে পারবি নে, উনি যে আজ তোকে এমন সুন্দর বীণাটা উপহার দিয়েছেন, গান না গাইলে সেটার কোন সার্থকতাই থাকবে না।"

সুবোধ বাবু প্রতিমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—ওঁর মধুর কণ্ঠের সঙ্গে বীণার সুরের অপূর্ব্ব সংযোগ শোনবার জন্যই তো সাগ্রহে বসে আছি—”

প্রতিমা আর কোন কথা না বলিয়া সলজ্জ হাস্যের সঙ্গে বীণাখানি কোলের উপরে তুলিয়া লইয়া তাহাতে সুর দিতে লাগিল। শীঘ্রই অপূর্ব্ব সুরের তরঙ্গে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রতিমা গাহিতে লাগিল :—

আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বার।
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন নদীর পারে
গহন কোন বনের ধারে
গভীর কোন অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার॥

গাহিতে গাহিতে প্রতিমা তন্ময় হইয়া গেল; সেই উৎসব গৃহের আলোক মালা, হাস্যপরিহাস, সঙ্গিনীগণের অস্তিত্ব, কিছুই যেন তাহার আর মনে রহিল না;—নিজের সৃষ্ট সুরতরঙ্গে ভাসিয়া দূরে—অতিদূরে কোন অজ্ঞাত স্বপ্নলোকে সে যেন চলিয়া গেল। শ্রোতারা সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া ছিল; গান কখন শেষ হইল, তাহারা তাহা বুঝিতে পারিল না, কেননা সুরের রেশ তখনও সমস্ত কক্ষটী এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া ছিল।

দীপ্তি প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—"এ কি গান রে, জন্মোৎসবের দিনে এমন গান কি গাইতে হয়, সমস্ত মনটা যেন উদাস বিষাদভারাক্রান্ত করে তুলেছে।"

সুবোধ বলিল—"প্রতিমা দেবী, আপনি যে একজন পেসিমিষ্ট, তা এই গান শুনেই বেশ বোঝা যায়।"

প্রতিমা অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করিতেছিল, গানের সমালোচনা সে শুনিতে পাইল কি না সন্দেহ, তাহার চক্ষু চারিদিকে কাহার সন্ধানে যেন ব্যস্ত ছিল। অনিন্দিতার কাণের কাছে মুখ লইয়া সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল…"মোহিত দা কোথায়, তিনি এলেন না?"

অনিন্দিতা ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিল,…"দাদা আমাকে তো বল্‌লে, তোরা আগে যা, আমি এই আস্‌ছি। দাদার কাণ্ড—আবার কোন দলে হয় ত ভিড়ে পড়েছে।"

প্রতিমা বিষণ্ণভাবে বলিল—"আমার বোধ হয় তিনি আর আসবেন না, সেই শিকারের নৌকায় চলে গিয়েছেন।"

"বলিস কি, নিশ্চয়ই আসবে। তোর জন্মতিথি, তুই নিজে বলে এসেছিস, দাদা কি না এসে থাকতে পারে!" অনিন্দিতা রহস্যপূর্ণ-ভাবে হাসিল।

প্রতিমা ঈষৎ কুপিত হইয়া—উত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহিরে 'গুড়ম, গুড়ম, গুড়ম' তিনবার বন্দুকের আওয়াজ হইল। শব্দে বোধ হইল, করুণাময় বাবুর বাড়ীর অতি নিকটেই গঙ্গার ধারে কি একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে উৎসবের হাস্য কোলাহল বন্ধ হইয়া গেল, পুরুষেরা সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া গঙ্গার দিকে ছুটিতে লাগিল; মেয়েদের মনে একটা অজ্ঞাত আতঙ্কের সঞ্চার হইল, তাহারাও অনেকে ত্রস্তপদে ছুটিয়া বাগানের মধ্যে নামিয়

পড়িল। যাহাদের সঙ্গে শিশু ছিল, তাহারা শিশুদের সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল। একটু পরেই প্রতিমা দেখিল, সেই বৃহৎ কক্ষে সে একা। সেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাগানের দিকের একটা দরজা দিয়া নামিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে মোহিত। তাহার মুখ গম্ভীর বিষণ্ণ, যে প্রসন্ন হাস্য তাহার অধরে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিত, তাহা যেন আজ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতেছে, নিশ্বাস ঈষৎ দ্রুত পড়িতেছে।

প্রতিমা বিস্মিতভাবে বলিল—"মোহিত দা···এত দেরী! একি তুমি হাঁপাচ্ছ যে! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

মোহিত যথা-সম্ভব শান্তকণ্ঠে বলিল—"একটা বিশেষ কাজে দেরী হয়ে গেল, কিছু মনে করো না, প্রতিমা।—আবার এখনি যেতে হবে বোটে, তারা সব আমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"সে কি মোহিত দা, মার সঙ্গে দেখা করে যাবে না?"

মোহিত ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিল—"তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে, আজ আর তো নিষ্কৃতি পাবার আশা নাই!"

"আর আমিই বুঝি তোমাকে সহজে নিষ্কৃতি দেব! না—না, মা বলছিলেন, আজ তোমাকে নিজে বসে খাওয়াবেন, এরই মধ্যে তোমাকে দশবার খুঁজেছেন।"

"মোহিত ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল—"ফিরে এসে জ্যাঠাইমা ও তোমার অনুরোধ পুরামাত্রায় রক্ষা করা যাবে। আজ শুধু তোমার জন্মতিথির আশীর্ব্বাদ—"

মোহিতের কথা অর্দ্ধসমাপ্তই থাকিয়া গেল, গঙ্গার ধারে—ফটকের নিকটে চীৎকার উঠিল, "খুন—খুন—"

প্রতিমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে অস্ফুটস্বরে ডাকিল, "মোহিত দা—মোহিত দা।" কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল, মোহিত আর সেখানে নাই, কখন চক্ষের পলকে অন্তর্হিত হইয়াছে। ফটকের দিক হইতে কয়েকজন দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সর্ব্বাগ্রে অনিন্দিতা হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রতিমার নিকটে আসিয়া বলিল—

শ্যামবাজারের অটল বাবু বোধ হয় এই বাড়ীতেই আস্‌ছিলেন। গঙ্গার ধারে গেটের কাছে কে যেন তাঁকে বন্দুকের গুলিতে খুন করেছে। সকলে বল্‌ছে, "এনার্কিষ্টদের কাণ্ড, অটলবাবু নাকি পুলিশের গোয়েন্দা ছিলেন!—"

"অ্যাঁ—সে কি—কি সর্ব্বনাশ—!" বলিতে বলিতে প্রতিমা ভয়ে অনিন্দিতাকে জড়াইয়া ধরিল।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা সহরে কোন সময়ে গভীর রাত্রি আরম্ভ হয় এবং কোন সময়ে তাহা শেষ হয়, বলা কঠিন। রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত লোকজনের গতায়াত, গাড়ী ঘোড়া, ট্যাক্সি-মোটরের ছুটাছুটি সমানভাবে চলিতে থাকে ; আবার ৪টার সময় হইতেই সহরে প্রভাতের সূচনা দেখা দেয়, জন কোলাহল জাগিয়া উঠিতে থাকে। সুতরাং রাত্রি ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত এই সময়টাই বোধ করি কলিকাতায় গভীর রাত্রি।

হেমন্তের এমনি এক 'গভীর রাত্রিতে,' কলিকাতার পথ জন বিরল হইয়া আসিয়াছে, ক্বচিৎ কোন পথিক ত্রস্তপদে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অন্ধকার গলির মধ্যে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইতেছে, দুই একজন নিশাচর ভাঙ্গা গলায় আধা বাঙ্গালা আধা হিন্দী মিশানো দুর্ব্বোধ্য গান গাহিতে গাহিতে পথ অতিক্রম করিতেছে। ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ, মোটরের গর্জ্জন, ছ্যাকড়া গাড়ীর আর্ত্তনাদ নীরব হইয়াছে, কলকারখানাগুলাও কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইতেছে। পূর্ব্বে যে বিপুল সহরটা কোলাহল মুখরিত ছিল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, যেন বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালার প্রকাণ্ড দৈত্যগুলা সারাদিনের ক্লান্তির পর ঈষৎ তন্দ্রাতুর হইয়া ঝিমাইতেছে। পল্লীর গাঢ় সুপ্তিমগ্ন নিশীথ, আর সহরের তন্দ্রাতুর রাত্রি শেষ, উভয়ের মধ্যে কি গভীর ব্যবধান! একের মধ্যে শান্তির সুষুপ্তি, অন্যের মধ্যে উত্তেজিত চিত্তের ক্ষণিক অবসাদ।

দর্জ্জিপাড়ার একটা পুরাতন জীর্ণ একতলা বাড়ীতে এই অসময়েও একটি রমণী জাগিয়া বসিয়াছিল। চূণ বালিখসা, রং চটা ঐ জীর্ণ

একতলা বাড়ীটার যেমন বয়স ঠিক করা যায় না, তেমনই রমণী তরুণী কি প্রৌঢ়া, তাহা বুঝা কঠিন। তাহার মুখের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটা কোমলভার দেখিয়া অনুমান হয় যে, বয়স ৩২।৩৩এর বেশী হইবে না; কিন্তু তাহার সমস্ত অবয়বের মধ্য দিয়া এমন একটা মলিনতার আবরণ পড়িয়া গিয়াছে, দুঃখ, দারিদ্র্য,—নৈরাশ্য, তাহার কোটরগত চোখের কালিমায়, ঈষৎ শিথিল গণ্ডদেশে এবং নিষ্প্রভ অধরে এমন সুস্পষ্ট ছাপ আঁকিয়া দিয়াছে যে, বোধ হয় রমণী যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তাহার অঙ্গে অঙ্গে একদিন হয়ত সৌন্দর্য্যের বন্যা দুকুল ছাপাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এখন সে বন্যা দূরে সরিয়া গিয়াছে। বর্ণ এককালে হয়ত গৌর বা উজ্জ্বল শ্যাম ছিল, এখন পাণ্ডুবর্ণ বলিলেও বলা যায়। কেশ অযত্ন সম্বদ্ধ, কত কাল যে তাহার সংস্কার হয় নাই, বলা কঠিন। দেহে প্রসাধনের বা অলঙ্কারের চিহ্ন মাত্র নাই, কেবল হাতে এয়োতির চিহ্ন এক জোড়া শাঁখা ও এক গাছি লোহা। পরণে একখানি ময়লা লাল পাড়ের শাড়ী লজ্জা নিবারণ করিতেছে। কিন্তু তাহারও স্থানে স্থানে তালি বাহির হইয়া জগতের সম্মুখে কদর্য্যভাবে নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছে।

একতলা ভাঙ্গা দালানটায় মাত্র একখানি ঘর একটু বড়, অন্য একখানি ঘরকে ঘর বলিলে—গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যার উপর অবিচার করা হয়। সেটা পূর্ব্বে অপ্রশস্ত বারান্দা ছিল, কোন রকমে ঘিরিয়া ঘরের মর্য্যাদা দান করা হইয়াছে। উহার একপাশে উনুন, অন্য পাশে কিছু তৈজস পত্র দেখিয়া অনুমান করিতে হয় যে, সেটি রান্নাঘর। অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ঘরটির মধ্যেও আসবাবপত্রের বিশেষ কিছু বালাই নাই। এককোণে দুএকটা টিনের পেটারা অতি সন্তপর্ণে দেহ রক্ষা করিতেছে, তাহারই উপরে দড়িতে কয়েকখানি ময়লা ধুতি ঝুলিতেছে। দেয়ালের গায়ে অর্দ্ধছিন্ন দেয়ালপঞ্জী অনাবৃত বক্ষ বিলাতী বিবির ছবি লইয়া সমস্ত ঘরটাকেই যেন বিদ্রূপ

হাস্তে লক্ষ্য করিতেছে। দরজার চৌকাঠের উপর কেরাসিনের ডিবা মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে বা ধূম উদ্গীরণ করিতেছে, কখন বা দমকা বাতাসে হঠাৎ গতাসু হইবার ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। সেই কেরাসিনের ডিবার ক্ষীণ আলোককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ঘরের ভিতরকার স্বচ্ছ অন্ধকার অটল অচল হইয়া বিরাজ করিতেছে। স্বচ্ছ অন্ধকারের মধ্যে একটু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায়, এক কোণে মলিন শয্যায় ১৬।১৭ বৎসরের একটী বালক ঘুমাইতেছে।

রমণী চৌকাঠের পার্শ্বে আলোর নিকটে বসিয়া ছিল, তাহার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি রাস্তার ধারের সদর দরজার দিকে। কিসের একটা উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তাহার শান্ত শীর্ণ বিষাদ ম্লান মুখখানি ছায়াচ্ছন্ন। এক একবার সে কাণ পাতিয়া দূরাগত পথিকের পথধ্বনি নিবিষ্টমনে শুনিতেছে, কখনও বা বাহিরের কোন একটা শব্দে চমকিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে ঘুমন্ত বালকের দীর্ঘনিঃশ্বাস পতনের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া অতি সন্তর্পণে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে, ভয়, পাছে সে জাগিয়া উঠে।

কিন্তু বালক সত্যই একবার জাগিয়া উঠিয়া ডাকিল—"মা !"

"কি বাবা ?"

"তুমি বসে রয়েছ কেন মা, ঘুমোও নি ? বাবা এখনো আসেন নি বুঝি ?"

পুত্রের এতগুলি প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মা শুধু সংক্ষেপে কহিল—"না, বাবা, তুমি ঘুমোও।"

( ২ )

বালক ঘুমাইয়া পড়িল। মাতা মলিনা ফিরিয়া আসিয়া আবার দ্বারপ্রান্তে বসিল। বাহিরে অন্ধকার, কিন্তু মলিনার হৃদয়ের ভিতরে

তাহা অপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকার। এতক্ষণ সে আসিল না কেন? মলিনার মন এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বামী তো প্রায়ই এমন বিলম্বে আসে, কোন কোন দিন রাত্রিতে বাড়ীতেই ফেরে না। কই অন্য দিন তো তাহার মনে এমন অমঙ্গলের আশঙ্কা হয় না! কি এক গুরুভার পাষাণের চাপে তাহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, সে যতই চেষ্টা করুক, সেই পাষাণের ভার মন হইতে নামাইতে পারিল না।

তাহার বোধ হইল, যেন কোন এক নির্ম্মম দানব তাহার হাত পা বাঁধিয়া অজ্ঞাত ভয়াবহ অন্ধকারের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। মলিনা শিহরিয়া উঠিল। বর্ত্তমান তাহার নিকট যন্ত্রণাময়, ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে ভুলিতে যাইয়া সে অতীতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারই মধ্যে সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিল। কিন্তু সেই অতীতের স্মৃতিও তো মধুময় নহে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা ছিল সে, তাহার কুমারী জীবন দুঃখের মধ্যেই কাটিয়াছে। পিতামাতার স্নেহ—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা তাহাও তাহাকে প্রচুর পরিমাণ দিতে পারেন নাই। তারপর তাহার বিশবৎসরের বিবাহিত জীবন;—মলিনা অতীতের অন্ধকার কক্ষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার মধ্যে কোথাও একটা ক্ষীণ আলোকের রেখাও দেখিতে পাইল না। জীবন সংগ্রামের নানা ভয়াবহ চিত্র একে একে নগ্ন কদর্য্য মূর্ত্তিতে তাহার মানসচক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দেখা দিত লাগিল। কত আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়াই সে স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু আজ সে সব দুঃস্বপ্নের মত কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীরা তাহাদের মেয়েদের পাতিব্রত্য ও আদর্শ নারীত্বের গর্ব্ব করে, কিন্তু তাহাদের বোধ হয় বুঝিবার শক্তি নাই যে, কি ভীষণ মূল্য দিয়া এই আদর্শের গৌরব দরিদ্র বাঙ্গালী কুলবধূকে রক্ষা করিতে হয়।

মলিনা নিত্য অভাব—নির্য্যাতন, অত্যাচার—তবু কোনরূপে সহ্য

করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যের মাত্রা পূর্ণ হইয়া উঠিল, যেদিন কি একটা কারণে স্বামী গোলকনাথের সামান্য কেরাণীগিরি কাজটীও গেল। গোলকনাথ অনেক চেষ্টা করিয়াও আর কোন কাজ জুটাইতে পারিল না। জীবনসংগ্রাম তাহাদের নিকট ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল।

বিশ বৎসর এই ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে মলিনা কাটাইয়াছে। একে একে সে সমস্ত কথা তাহার মনে হইতে লাগিল, আর পাঁজরের এক একখানি করিয়া হাড় যেন খসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জীর্ণ বাড়ীতে তাহারা কোন রকমে এখন মাথা গুঁজিয়া আছে। অলঙ্কার তৈজসপত্র সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন কোন দিন অন্ন জুটে, কোন দিন জুটে না। যেদিন জুটে না, সেদিন মাতাল স্বামী গোলকনাথের নিকট হইতে চড় চাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া পদাঘাত পর্য্যন্ত, সমস্ত পুরস্কার সহ্য করিবার জন্যই তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হয়। একমাত্র সন্তান কিশোরের জ্ঞানতৃষ্ণা বড় প্রবল ছিল। কিন্তু মলিনা পুত্রের ক্ষুধার অন্ন যেমন সব সময়ে যোগাইতে পারিত না, তেমনি তাহার জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার ব্যবস্থাও করিতে পারিল না। একালের স্কুলের গুরুমহাশয়েরা প্রাচীন ঋষিদের মত বিদ্যা দান করিতে প্রস্তুত নহেন; সুতরাং দক্ষিণাদানের অভাবে শীঘ্রই কিশোরকে স্কুলের ছাত্রজীবন শেষ করিতে হইল। সেদিন কিশোর খুব সকাল সকাল মলিন মুখে ক্লান্ত চরণে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"মা!"

মলিনা তখন ছেড়া কাপড় দিয়া একখানা কাঁথা সেলাই করিতেছিল; সেলাই রাখিয়া পুত্রের মলিন মুখের দিকে চাহিয়া উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে কিশোর, কি হয়েছে তোর? অসুখ করেনি তো? এত সকালে ফিরে এলি যে?"

কিশোর কাঁদ কাঁদভাবে বলিল—"মা, তারা আমার নাম কেটে দিয়েছে। হেড মাষ্টার মশায় বল্লেন; তুই মাইনে দিতে পারিস্ না, তোর আর কাল থেকে ইস্কুলে এসে কাজ নেই।"

মলিনা পুত্রের মুখের কথা শুনিয়া বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল, একটী কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না; কিছুক্ষণ পরে কেবল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন তাহার হৃৎপিণ্ড মথিত করিয়া বাহির হইয়া আসিল। গোলকনাথ গৃহে ফিরিলে মলিনা পুত্রের কথা তাহাকে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিল। গোলকনাথ একটা বিকৃত হাসি হাসিয়া বলিল—"যে বিদ্যে হয়েছে, ওতেই গাড়োয়ানী করতে পার্‌বে। আর বেশী বিদ্যেয়—কাজ নেই।"

মলিনার দুই গণ্ড বহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে তাহা রোধ করিতে পারিল না।

এই সব কথাই মলিনার আজ মনে পড়িতেছিল। পার্ব্বতীয় নদীতে বন্যা আসিলে, যেমন তাহা বাধা মানিতে চায় না, একটীর পর একটী বাণ ছুটিয়া আসিয়া তটভূমিকে প্লাবিত করিয়া ফেলে, অতীত স্মৃতির প্লাবন মলিনার চিত্তও আজ তেমনিভাবে অধিকার করিয়া বসিল। কিন্তু শরীরের ন্যায় মনেরও ক্লান্তি আসে। দেহ যেমন অতিরিক্ত শ্রমের পর কাজ করিতে চায় না, মনও তেমনি চিন্তার ক্লান্তি হইতে বিশ্রামলাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। মলিনার মনও শ্রান্ত হইয়া পড়িল। দরজার চৌকাঠের উপর মাথা রাখিয়া সে ঈষৎ তন্দ্রাবিষ্ট হইল। তন্দ্রাঘোরে সে দেখিল, যেন আদলেতের পেয়াদা সঙ্গে করিয়া একজন কাবুলীওয়ালা আসিয়া তাহার দুয়ারে আঘাত করিয়া বলিতেছে—"এই দরজা খোল, দরজা খোল।"

মলিনার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল,—শুনিল, সত্যই কে যেন বাহিরের দরজায় আঘাত করিতেছে।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

মলিনা দরজা খুলিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত, সর্ব্বেন্দ্রিয় অসাড় বোধ হইতে লাগিল। দরজার নিকটে কাবুলীওয়ালা বা আদালতের পেয়াদা নহে, একজন মুসলমান গাড়োয়ান ; একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী হইতে সে একটী জড়পিণ্ডবৎ অসাড় দেহ টানিয়া বাহির করিতেছে। মলিনার পায়ের গোড়ায় দেহটাকে রাখিয়া গাড়োয়ান সভয়ে এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল—"মাইজী, আমার কোন কসুর নাই। বাবুজী গাড়ীতে যখন উঠেছেন, তখন বেহুস মাতাল, এখন দেখ্ ছি—"

বলিয়াই গাড়োয়ান কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া এক লম্ফে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং তীরবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটিল যে, মলিনার মনে হইল, যেন সে কোন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল ; কিন্তু পরক্ষণেই ভূপতিত গোলকের দেহের দিকে চাহিয়া বুঝিল, এ স্বপ্ন নয়, অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্য। মলিনা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া স্বামীর কানের কাছে মুখ লইয়া কয়েকবার ডাকিল, তারপর সজোরে ঠেলা দিল ; কিন্তু সে দেহ সাড়া দিল না, প্রাণের কোন লক্ষণই তাহাতে দেখা গেল না। মলিনা বুকে হাত দিয়া দেখিল, কোন স্পন্দন নাই, নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিল, নিঃশ্বাসের কোন অনুভূতিই পাওয়া যায় না।

মলিনার হৃৎপিণ্ডের রক্তস্রোত যেন বন্ধ হইয়া গেল, প্রত্যূষের অস্পষ্ট আলো-আঁধারে সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

মলিনার যখন জ্ঞান হইল তখন সে নিজেদের বাড়ীর উঠানে, কিশোর তাহার চোখে মুখে জল দিতেছে। কিন্তু একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই সে দেখিল, উঠানে গোলকের মৃতদেহ পড়িয়া আছে; বাহিরের দরজা বন্ধ, ঘোড়ার গাড়ী বা গাড়োয়ানের কোন চিহ্নই নাই।

মলিনা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"বাবা কিশোর, আমার কি হল রে!" এবং মাটীতে পড়িয়া ছিন্নকণ্ঠ বিহঙ্গের মত ছটফট করিতে লাগিল।

বালক কিশোর মাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে, বুঝিতে পারিল না, সে কেবল নিরুপায়ভাবে ধীরে ধীরে মায়ের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

প্রকৃতি নিষ্ঠুর, বিশ্বজগৎ হৃদয়হীন, তাহারা মানুষের দুঃখকষ্ট বিপদ বুঝে না, তাহার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিবারও প্রয়োজনবোধ করে না, আপনার মনে অনন্তকালের পথে ঠিক নিয়মিতভাবেই ছুটিয়া চলে। সুতরাং যথাসময়ে সে কাল রজনীর অবসান হইল, ভোরের আলো দেখা দিল। সূর্য্যকরচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইল, নগরের কোলাহল জাগিয়া উঠিল;—যেন কোথায়ও কিছু হয় নাই, জগতের কোন পরিবর্ত্তনই ঘটে নাই। চারিদিকের সেই উদাসীন হৃদয়হীনতার মধ্যে কেবল মাতা ও পুত্র, সম্মুখে মৃতদেহ লইয়া নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল।

( ২ )

মলিনা বেদনাতুর কণ্ঠে ডাকিল—"বাবা কিশোর।"

"কি মা?"

"আর ত এমন করে বসে থাকা চলে না। তুই যাতো বাবা চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী, আর সুশীলাদের বাড়ীও একটা খবর দে। তারা এলে—"

তারা আসিলে কি করিতে হইবে, মলিনা তাহা বলিতে পারিল না

বা ভাবিতেই পারিল না। কিশোর কিন্তু মায়ের মনোভাব বুঝিল এবং ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

মানুষের কি বিচিত্র মন! স্বামীর অত্যাচারে পীড়িত হইয়া মলিনা কতদিন বৈধব্যকেও তুলনায় প্রিয় মনে করিয়াছে, এবং তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই; কিন্তু আজ যখন সেই বৈধব্য সত্যসত্যই তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া মলিনা শিহরিয়া উঠিল। এই তো তাহার স্বামী, জীবনের বিশ বৎসর সুখে দুঃখে, যাহার সঙ্গে একত্র কাটাইয়াছে,—দারিদ্র্য হইতে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে যাহার হাত ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—যাহাকে অবলম্বন করিয়া, এই কঠোর, নির্দ্দয়,হৃদয়হীন সমাজ ও সংসারের সকল আঘাত সহ্য করিয়াছে—সে অকস্মাৎ কোথায় চলিয়া গেল! যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে একটা কথাও বলিয়া যাইতে পারিল না, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে সেও স্বামীর নিকটে অন্তরের নিগূঢ়তম দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। হোক না কেন, মাতাল, চরিত্রহীন, অত্যাচারী,—তবু সে তো তাহার স্বামী। জীবনের কত সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, হাসিকান্না,—কত অতীতের স্মৃতি, বর্ত্তমানের নৈরাশ্য, ভবিষ্যতের আশঙ্কা তাহার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল; তাহার সকল মান অভিমান, ক্রোধ, ঘৃণা বিরক্তি এই দরিদ্র অপদার্থ স্বামীকে ঘিরিয়াই রচিত হইয়াছিল! আর কী শোচনীয় এই মৃত্যু! ইহাকে কোন দিন সে কল্পনাও করিতে পারে নাই! এমন অসহায়ভাবে, নিতান্ত দীন দরিদ্র ভিক্ষুকের মতো, গৃহতাড়িত পথের কুকুরের মতো, অবশেষে তাহার জীবলীলা সাঙ্গ হইল,—এই কথা ভাবিতে মলিনার মর্ম্মগ্রন্থি তীব্র বেদনার টানে ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল।

যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই অত্যাচারী চরিত্রহীন স্বামীর সকল দোষ তাহার স্মৃতি হইতে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, আর অতীতের গর্ভ

হইতে জাগিয়া উঠিয়া স্বামীর অতি সামান্য গুণ, সামান্য একটু ভালবাসাও তাহার চিত্তে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই তাহার কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থল, জীবনের প্রথম প্রভাত,—লাজরক্ত নববধূ সে; সেদিন প্রভাত সূর্য্যের মতোই তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তরুণ কন্দর্পপ্রতিম গোলকনাথ! কুসুমে তখনও কীট দেখা দেয় নাই, বাঁশী তখনও বেসুরা বাজে নাই; তাহার প্রতি গোলকনাথের ভালবাসা কত তীব্র আবেগময়ই না ছিল। সর্ব্বদা তাহাকে নয়নে নয়নে বুকে বুকে রাখিয়াও গোলকের তৃপ্তি হইত না। সমস্ত রাত্রি তাহাদের দুজনের চোখে ঘুম ছিল না, কত অর্থহীন বাজে কথা বলিয়া পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাহারা নিশিভোর করিয়া দিত। সমবয়স্কেরা কত কাণাকাণি করিত, তাহাদের বেহায়াপনার উল্লেখ করিয়া কত টিটকারী দিত, আর তাহাদের সেই হাসিঠাট্টা বিদ্রূপ অনুযোগ কতই না মধুর বোধ হইত। তাহার পর যখন তাহাদের একটী খোকা হইল, তখন তরুণ পিতামাতার কী সে অসীম, অবর্ণনীয় আনন্দ! দুইজনে কাড়াকাড়ি করিয়া খোকাকে কোলে লইত, যেন পুত্রস্নেহে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত! কিন্তু শরৎপ্রভাতের নির্ম্মল আকাশ যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি কি জানি কাহার অভিশাপে, বেশীদিন তাহাদের জীবনের এই মধুময় স্বপ্ন স্থায়ী হইল না!—

"দিদি!"—

দরজা ঠেলিয়া একটী রমণী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। রমণী কৃশকায়া গৌরাঙ্গী, পরণে সাদা থান, চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, ললাটে সিন্দুর বা হাতে আয়তীর চিহ্ন নাই, মুখে একটা বিষাদ শান্ত ভাব। মলিনা তাহার ডাক শুনিতে পাইল না, পদশব্দেও ফিরিয়া চাহিল না। রমণী আবার স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিল—"দিদি"!

মলিনা এইবার মুখ তুলিয়া রমণীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। কহিল—"কে সুশীলা এসেছিস!"—বলিয়াই তাহার চোখে অশ্রুর বাণ ছাপাইয়া আসিল। সেই অশ্রু ধারায় মলিনার দুই গণ্ড ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দুই জনেই কিয়ৎক্ষণ কোন কথাই বলিতে পারিল না।

অবশেষে সুশীলা কহিল—"দিদি, যা হবার তাতো হয়েছে, এখন কি উপায় হবে? কিশোর বড়দাকে বল্‌তেই তিনিতো রাগে জ্বলে উঠলেন, বল্‌লেন, হতভাগা মাতালটা অপঘাতে মরেছে, তার আবার সৎকার করতে যাব, আমাকে দিয়ে সে সব কিছু হবে না।"

বলিয়াই সুশীলা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মলিনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"দিদি, মানুষ এতো নিষ্ঠুর! মানুষের এই বিপদের সময়েও সে ক্ষমা করতে পারে না! অতি বড় শত্রুও যে—"

মলিনা ধীরে ধীরে আপনার চোখের জল মুছিল, জোর করিয়া অশ্রু প্রবাহ নিরোধ করিয়া স্থির শান্ত কণ্ঠে বলিল,

"সুশীলা, কাঁদিস্ নে ভাই। আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে; ভগবান যাকে মেরেছেন, সামান্য মানুষের নিষ্ঠুরতায় আর তার বেশী কি করতে পারবে! তুই যা, এর মধ্যে বসে থেকে কাজ নেই বোন!"

"তোমাকে এই অসহায় অবস্থায় রেখে কেমন ক'রে আমি যাব দিদি!—আমার যে পা উঠছে না!"

এমন সময় বাহির হইতে কে কর্কশ কণ্ঠে ডাকিল,—"সুশী, সুশী, হতভাগী, এরই মধ্যে এখানে এসে জুটেছিস? শীগ্‌গীর বাড়ী যা বলছি!"—

মলিনা ব্যস্ত ভাবে কহিল,—"সুশীলা যা বোন, তোর দাদা ডাক্‌ছেন! আমার জন্য শেষে তোর শাস্তি হবে—!"

সুশীলা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অঞ্চল প্রান্ত দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় কিশোর ফিরিয়া আসিল। তাহার কমনীয় কান্তি এর মধ্যেই শুকাইয়া গিয়াছে, চোখমুখ বসিয়া গিয়াছে; চুল রুক্ষ, যেন দীর্ঘকাল পরে রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। কিশোর আসিয়াই অবসন্ন ভাবে মাটীতে বসিয়া পড়িল। মার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ ভয়ে ভয়ে, ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল,—

"মা, পাড়ার কেউতো আসতে চাইচে না, বলে, ও অপঘাতের রোগী, আমরা সৎকার করতে যাব না। চক্রবর্ত্তী কাকার পায়ে ধরে কত কাঁদলেম, তবু তাঁর মন নরম হল না। তিনি বল্লেন,—'এ সব পুলিশের হাঙ্গামার মধ্যে আমি যেতে পারবো না। তার পর বিনা প্রায়শ্চিত্তে শ্মশানে নিয়ে গেলে, তাঁদের জাতও নাকি যাবে। আমি যখন কিছুতেই তাঁর পা ছাড়লেম না, তখন তিনি বিরক্ত হয়ে বল্লেন—

কিশোরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না, কেবল তাহার দুই চোখ দিয়া ফোটা ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মলিনা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"চক্রবর্ত্তী মশায় কি বল্লেন—?"

কিশোর অতিকষ্টে অনুচ্চ স্বরে কহিল,—"বল্লেন, মুদ্দফরাস ডেকে গঙ্গায় ফেলে দাও গে যাও! পয়সাটা না হয় আমিই দেবো।"

মলিনা বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, চোখে একফোটা অশ্রু দেখা দিল না; যেন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, অশ্রুর উৎস শুকাইয়া উঠিয়াছে।

## নবম পরিচ্ছেদ

মধ্যাহ্ন আকাশ হইতে সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িল, ক্রমে তাহার শেষরশ্মি গঙ্গার অপর পারে পশ্চিমের সোনালী মেঘের মধ্যে মিলাইয়া গেল। সহরের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। এ সন্ধ্যা কাব্যে বর্ণিত "লাজ-নম্র নববধূ সম" নহে, কলের চিমনীর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, গলির মোড়ে মোড়ে গ্যাসের আলোকে ম্লান, ট্রাম মোটর গাড়ীর শব্দে মুখর। মলিনা ও কিশোর ঠিক তেমনই ভাবে গোলকের মৃতদেহ লইয়া বসিয়াছিল। বাহিরে সন্ধ্যার সেই অন্ধকার, কোন রূপ আশার আলোকের চিহ্নমাত্র সেখানে দেখা যাইতেছিল না। আকাশে মেঘ করিয়াছিল এবং তাহারই সংবাদ বহন করিয়া দমকাবাতাস মাঝে মাঝে ছুটিয়া আসিয়া পুরাতন দরজাজানলা গুলা সশব্দে কম্পিত করিয়া যাইতেছিল।

আবার সদর দরজার কড়া কে সজোরে নাড়িতে লাগিল। এশব্দ বড়ই রুক্ষ, কর্কশ, অধীরতা ব্যঞ্জক। কিশোর দরজা খুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধ গৃহস্বামী, তাঁহার মুখ বিরক্তি ব্যঞ্জক। মমতা বা সহানুভূতির চিহ্ন মাত্র তাহাতে খুজিয়া পাওয়া যায় না। ক্রুদ্ধভাবে তিনি বলিলেন,—

"তোমাদের কাণ্ড কারখানা কি বল দেখি? সারাদিন উঠানে মড়া আগলে বসে আছ, শ্মশানে যাবার কোন উদ্যোগই তো দেখতে পাচ্ছিনা। শেষে আমার বাড়ী খানাই নষ্ট হবে, ভাড়া জুটবে না—"

কিশোর অস্ফুট স্বরে বলিল—"পাড়ার কেউই তো আসতে চাইলেন না—"

"আসতে চাইবে কেন? অপঘাত মৃত্যু, কেউই কাঁধে করতে স্বীকার করবে না।"

কিশোর কাতর কণ্ঠে বলিল—"তাহলে উপায় ?"

"উপায় কি, তা কি আমি জানি ? আমি কি স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা দিতে এসেছি ? তোমাদের জন্য অনেক সহ্য করেছি, মনে করেছিলাম, তোমরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু আর নয়। আমাকে এখনই মিউনিসিপালিটিতে খবর দিয়ে মুদ্দফরাস ডাক্‌তে হবে।" বলিয়া বৃদ্ধ প্রস্থানোদ্যত হইল।

মলিনা লজ্জা ত্যাগ করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"কিশোর, ওঁকে বল যে, সে সব কিছুই করতে হবে না, আমরা এখনই শ্মশানে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধ যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং একটা ক্রুদ্ধ জ্বলন্তদৃষ্টি শেষ অস্ত্রের মত নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

"কিশোর যা কোনদিন ভাবিনি, তাই আজ করতে হবে। পারবে কি বাবা!"

কিশোর ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"কি মা ?"

মলিনার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে তাহা রোধ করিতে পারিল না। অবশেষে অতিকষ্টে আত্ম সংবরণ করিয়া বলিল—

"চল, মায়ে পোয়ে আমরাই শ্মশানে নিয়ে যাই। আর যে উপায় নেই বাবা! আমাদের যে কেউ নাই—!"

বালক কিশোর স্তম্ভিত ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া মার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"মা—মা—মাগো—শেষে কি—"

কিশোর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

মলিনা কিশোরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে, অতি ধীরে অকম্পিত কণ্ঠে বলিল—"চুপ কর বাবা! আমার আর কি আছে, আমার সকল

লজ্জার যে শেষ হয়েছে। ওঠ, মন দৃঢ় কর। বিধাতা যাদের মেরেছেন, তাদের আর উপায় কি?”

সেই দিন কৌতূহলী পথিকেরা যখন দেখিল, একটী ভদ্রঘরের রমণী ও একটী বালক অতিকষ্টে মৃতদেহ বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতেছে, তখন তাহারা একটু বিস্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ জগতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে! অবস্থা বিশেষে এই জনপূর্ণ লোকালয় অরণ্যের চেয়েও জনশূন্য ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

## দশম পরিচ্ছেদ

শ্মশানের শেষ স্মৃতিচিহ্ন গঙ্গার জলে ধুইয়া গিয়াছে।

কিশোর ডাকিল—'মা!'

"কি বাবা!"

"চল, বাড়ী চল।"

"কোথায় যাব বাবা, বাড়ী কোথায়! আমাদের কি মাথা রাখিবার ঠাঁই আছে। আমরা যে একান্ত নিঃস্ব। এজগতে আমাদের কেউ নাই। কার দুয়ারে যাব, কে আশ্রয় দিবে!"

তাই তো, এ বিপুল বিশ্বে তাহাদের তো আপনার বলিতে কেহ নাই। উপরে অনন্ত আকাশ—নির্ম্মল, নীল, নক্ষত্র মণ্ডিত, যেন নীলরঙ্গের চাঁদোয়ার উপরে কে দীপমালা জ্বালাইয়া দিয়াছে। সম্মুখে কলনাদিনী গঙ্গা, অষ্টমীর চন্দ্রকরচ্ছটায় ঝলমল করিতেছে। দূর হইতে ঐ সহরের আলোক মালার শেষরেখা গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে। নগরের কোলাহল ঈষৎ ক্ষীণভাবে ভাসিয়া আসিতেছে। এই যে সুন্দর ধরণী, এত বড় জনাকীর্ণ নগরী,—এরা কি এত নির্ম্মম, এত হৃদয় হীন? এক অনাথা রমণী ও পিতৃহীন অসহায় বালক, এই দুটিমাত্র প্রাণীকেও আশ্রয় দিতে কি তাহারা অক্ষম? —মলিনা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল,—অন্ধকারাচ্ছন্ন সীমাহীন ভবিষ্যতের মধ্যে সে কোন কুল কিনারা দেখিতে পাইল না। তাহারা যে জীর্ণ বাড়ীতে এতদিন মাথা গুঁজিয়া ছিল, তাহার ভাড়া সামান্য হইলেও, বৎসরাধিক তাহা দেওয়া হয় নাই। গৃহস্বামী প্রত্যহই আসিয়া সেজন্য তর্জ্জন গর্জ্জন করে এবং পরদিনই গৃহ হইতে জোর করিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখায়। কাল প্রভাতে সে যে, ও আর তাহাদের থাকিতে দিবে না, তাহাতে সন্দেহ মাত্র

নাই। তখন ছেলের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়ানো ভিন্ন আর তাহার গত্যন্তর নাই। এ কথা ভাবিতেই মলিনা শিহরিয়া উঠিল, এতদিন সুখেদুঃখে কোনরূপে ভদ্রকুলবধূর মতই সে জীবন যাপন করিয়াছে। আজ কিনা পুত্রের হাত ধরিয়া সামান্য ভিখারিণীর মত তাহাকে পথে দাঁড়াইতে হইবে! তার পর, তাহার এক কাণাকড়িও তো সম্বল নাই! তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল, সবই তো ঋণের দায়ে বাঁধা পড়িয়াছে বা বিক্রী হইয়া গিয়াছে। তাহার নিজের অলঙ্কার আয়তির শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়া সে সংসার চালাইয়াছে। সেবার গোলক নাথ জ্বর ও নিউমোনিয়া রোগে তিনমাস শয্যাগত ছিল, বিনা চিকিৎসায় বিনা পথ্যে সেই বারই তাহার প্রাণ যাইত। শেষ আভরণ, মাতৃদত্ত একজোড়া স্বর্ণবলয়—যাহা সে অতি গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত মায়ের স্মৃতিচিহ্নটুকু—কিছুতেই ত্যাগ করিবে না ভাবিয়াছিল,—অবশেষে তাহাও স্বামীর চিকিৎসা ও পথ্যের জন্য তাহাকে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। আজ যে সে একবেলা একমুঠা অন্ন পুত্রের মুখে তুলিয়া দিবে, এমন সম্বলও তাহার নাই। মাতা পুত্রে অনাহারে পথের ধারেই তাহাদের মরিতে হইবে,—কুকুর বিড়াল যেমন করিয়া মরে, ঠিক তেমনি অসহায় ভাবেই মরিতে হইবে। সে শুনিয়াছে, কলিকাতায় তাহার মতো অনেক অনাথা বিধবা বড়লোকের বাড়ীতে পাচিকাবৃত্তি, দাসীবৃত্তি করিয়া, বা তদপেক্ষা নীচ জঘন্য উপায়ে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। তাহাকেও কি অবশেষে ঐ সব জঘন্য উপায়ে প্রাণধারণ কবিতে হইবে? একথা কল্পনা করিতেই মলিনার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল, হৃৎপিণ্ডে কে যেন সজোরে হাতুড়ির ঘা মারিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া দিল।

মলিনার মনে হইল, এমন করিয়া বিশ্বের ঘৃণিত, সমাজের উপেক্ষিত, অজ্ঞাত আবর্জ্জনা স্বরূপ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? জীবনের

এতই কি মমতা? হিন্দুনারীর মর্য্যাদার চেয়ে জীবনের মূল্য বেশী নহে!—দূরে অই দিগন্তবিস্তৃত গঙ্গা—কি প্রশান্ত উহার বক্ষ, কি শীতল উহার বারি রাশি! তাহার মত অনাথা হিন্দু বিধবার জন্য ঐ জাহ্নবীর শীতল ক্রোড়ই তো শেষ আশ্রয়! কিন্তু আত্মহত্যা—সে যে মহাপাপ!—হোক পাপ!—প্রতিদিন পাপজীবন যাপন করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আত্মহত্যা করার চেয়ে একদিনেই সব শেষ করিয়া দেওয়া ভাল নয় কি? তবে কিশোর—অসহায় মাতৃহীন বালক কিশোরের কি গতি হইবে? কিন্তু মলিনা থাকিয়াই বা তাহার কি করিবে?

মলিনা আর ভাবিতে পারিল না—ভাবিবার শক্তিও তাহার লোপ পাইয়াছিল। তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে প্রচণ্ড শক্তিতে আকর্ষণ করিয়া গঙ্গার দিকে লইয়া যাইতেছে!

* * * *

কিশোরও এতক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল। জলে একটা ভারী জিনিষের পতনের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—তাহার মা নাই, কেবল গঙ্গাবক্ষে একস্থলে তরঙ্গরাশি আলোড়িত হইতেছে। কিশোর একবার বুকভাঙ্গা স্বরে ডাকিল—'মাগো'—! পরক্ষণেই সে-ও গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। গঙ্গার বারিরাশি আবার কিছুক্ষণ আলোড়িত বীচিবিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং অবশেষে স্থির প্রশান্তভাব ধারণ করিল। কেহ দেখিল না, জানিল না যে, বিশ্বের এককোণে এমন একটা ছোটখাট বিপ্লব হইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে সূর্য্য উঠিল, জগৎ হাসিল, জীবন প্রবাহ পূর্ব্বের মতই অবাধে কালের পথে ছুটিতে লাগিল। কয়েকটী প্রাণী সেই যাত্রার পথ হইতে কখন যে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, নির্ম্মম নিয়তির রথচক্রতলে পরাজিত, নিষ্পেষিত, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেহ তাহার সন্ধানও করিল না। এই জগৎ—এই জীবন—এই সংসার!

## একাদশ পরিচ্ছেদ

সুদীর্ঘ সাত বৎসর। কিশোর এই সুদীর্ঘ সাত বৎসর যাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, গঙ্গার কুলে কুলে, পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে যাহার অনুসন্ধান করিয়াছে, কই তাহার সন্ধান তো মিলিল না! সেই কাল-রাত্রিতে গঙ্গার জলস্রোতের মধ্যে সে জ্ঞানহারা হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। একজন মাঝি গঙ্গাগর্ভ হইতে তুলিয়া তাহাকে প্রাণে বাঁচাইল বটে, কিন্তু তাহাকে না বাঁচাইলেই ভাল হইত। সে সর্ব্বস্ব হারা হইয়া এ জগতে বাঁচিয়া থাকিয়া কি করিবে? তাহার স্নেহময়ী মাকে সে কি আর সত্যই ফিরিয়া পাইবে না, গঙ্গার বারিরাশি কি সেই দেবী প্রতিমাকে চিরদিনের জন্য গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে? কিশোর কিছুতেই একথা বিশ্বাস করিতে পারিত না। তাহার মনে হইত, নিশ্চয়ই তাহার মাকে কেহ জল হইতে তুলিয়া বাঁচাইয়াছে। এবং দয়া করিয়া গৃহে আশ্রয় দিয়াছে। কিন্তু কে সে মহাপ্রাণ ব্যক্তি! যদি কিশোর তাহার সাক্ষাৎ পাইত, তবে চিরজীবন কৃতদাসরূপে ঋণ পরিশোধ করিত। কিশোর পাগলের মত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত, কৃষক পল্লীতে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে সন্ধান করিত, কিন্তু কেহই তাহাকে কোন আশ্বাস দিতে পারিত না। তাহার ছিন্ন মলিন বসন, তৈলহীন রুক্ষ কেশ, উদাস দৃষ্টি দেখিয়া গ্রামের বালকেরা অনেক সময় তাহাকে পাগল মনে করিত এবং পাছে পাছে দল বাঁধিয়া অনুসরণ করিত। কোন কোন মাতব্বর গ্রামবাসী তাহাকে আড়কাঠী বা গোয়েন্দা স্থির করিয়া গ্রাম হইতে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিত। কিন্তু কিশোর এসব লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিত না।

একবার ব্যাপারটা একটু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া জলপূর্ণ কলসীকক্ষে গ্রামপথ দিয়া গৃহে

ফিরিতেছিল ; তাহার সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত, মুখ ঈষৎ অবগুণ্ঠনে ঢাকা। কিশোরের মনে হইল, সে-ই তাহার মা। সে অনেকক্ষণ স্ত্রীলোকটীর দিকে চাহিয়া রহিল, শেষে তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। স্ত্রীলোকটি যখন একটী বাড়ীর দরজার নিকটে আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন কিশোর হঠাৎ তাহার পদতলে পড়িয়া—'মা—মা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রমণী কিছুক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে ধীরে ধীরে বলিল—"কেন বাছা, তুমি কাঁদছো, তোমার কি মা নেই ?"

কিশোর উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—"তুমিই তো আমার মা, এতদিন তোমাকেই আমি গ্রামে গ্রামে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি কিনা এখানে এসে লুকিয়ে রয়েছ ?"

রমণীর মন স্নেহে গলিয়া গেল, ভাবিল, মা হারাইয়া ছেলেটীর কি দশাই হইয়াছে ! প্রকাশ্যে বলিল—

"হাঁ গা বাছা, তোমার কি বাবাও নেই, পথে পথে এমন করে বেড়াচ্ছ ? আহা, আজ কিছু খাওনি বুঝি, মুখ যে শুকিয়ে গেছে !"

কিশোর আরও দৃঢ়ভাবে রমণীর পা জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"আমাকে আর ফাঁকি দিতে পারবে না মা, আমি আর তোমাকে ছেড়ে দেব না।"

ইতিমধ্যে চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর কয়েকটী ছেলে দৌড়াইয়া আসিল এবং কিশোরকে সজোরে টানিয়া তুলিয়া বলিল—

"বেরোও এখান থেকে, পাগলামি করবার আর জায়গা পাওনি !"

কিশোর জোড় হাতে মিনতি করিয়া বলিল—"আমাকে মার আর যাই কর, আমি মাকে ছেড়ে যেতে পারবো না।"

"কে তোর মা, এখানে তোর কেউ নেই—" বলিয়া ছেলেরা কিশোরকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া বলিল—।

রমণী করুণ মমতাপূর্ণ স্বরে বলিল—"ওরে, নগু দেবু, ওকে ওরকম করে তাড়াসনে, গেরস্তর অকল্যাণ হবে ;—আহা, বাছা আমার সারাদিন কিছু খায় নি !"

কিন্তু নগু দেবু মায়ের সে করুণ আবেদনে কর্ণপাত করিল না, তাহারা ততক্ষণ কিশোরকে টানিয়া লইয়া বড় রাস্তার মোড়ে ছাড়িয়া দিয়াছে।

সত্যই সেদিন আর কিশোরের কিছু খাওয়া হইল না। অনেকদিনই এমন অনাহারে যাইত। কোন গৃহস্থ দয়া করিয়া হয়ত কোন দিন তাহাকে কিছু খাইতে দিত। অথবা কোন চাষার ক্ষেতে মজুরী করিয়া কোনদিন কিছু রোজগার করিত। রাত্রে প্রায়ই সে ঘুমাইত না ; গঙ্গাতীরে ঘুরিয়া বেড়াইত, অথবা ঘাটে বসিয়া থাকিত। কখনো কখনো অতিরিক্ত শ্রান্তি বোধ হইলে, ইট মাথায় দিয়া গাছের তলায় বা গঙ্গার ঘাটেই ঘুমাইয়া পড়িত। যেদিন বেশী সৌভাগ্য হইত, সেদিন রাত্রে হয়ত কোন গৃহস্থের বাহিরের বারান্দায় আশ্রয়লাভ করিত।

* * * *

কাঞ্চনপুরের ঘাটে কারখানার কুলীরা ষ্টীমারে মাল তুলিতেছিল। কিশোর অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছিল। সেই প্রভাত সূর্য্যালোকে কুলীদের শ্রমের উৎসাহ ও আনন্দ, হাস্যপরিহাস, পরস্পরের প্রতি শ্লীল অশ্লীল সর্ব্বপ্রকার সম্ভাষণ,—দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি—কিশোরের বড়ই ভাল লাগিতেছিল,—মনে হইতেছিল, ইহারা কেমন সুখী, জীবনে কোন চিন্তা নাই, ভাবনা নাই ; গৃহে হয়ত মা আছে, স্ত্রীপুত্র আছে, তাহারাও সুখী, সন্তুষ্ট। কিন্তু সরল কিশোর যদি সব কথা জানিত, যদি যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া, সমস্ত রহস্য তাহার দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ হইত, তবে সে নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইয়া যাইত ; বুঝিত—কি গভীর দুঃখময় তাহাদের জীবন, কত অত্যাচার নির্য্যাতন, মাথা নীচু করিয়া তাহাদিগকে সহ্য করিতে

হইতেছে, প্রবল ধনিকের রথচক্র নিষ্পেষণে তাহাদের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, লোভের লেলিহান রসনা তাহাদের হৃদয়শোণিত পান করিতেছে, সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা এই দীনদরিদ্রের মুখের অন্নে পর্য্যন্ত ভাগ বসাইতেছে! ইহারা হাসে খেলে আনন্দ করে, কেননা তাহা না করিয়া পারে না;— মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াও মানুষ এমনি করে। মৃত্যুকে নিশ্চিত জানিয়াও মানুষ যদি তাহাকে উপহাস না করিতে পারিত, তবে বোধ হয় পৃথিবী এতদিনে শ্মশানে পরিণত হইত।

একটা ভারী মাল কুলীরা সকলে মিলিয়া কিছুতেই ঠেলিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। কিশোর দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। একজন কুলী চটিয়া গিয়া বলিল, "এই, তুই যে বড় হাসছিস, আয় ধর দেখি, তোর কেমন মুরদ!"

কিশোর বিনাবাক্যব্যয়ে যাইয়া অন্যান্য কুলীদের সঙ্গে মালের গাঁটটা ধরিল এবং এমন একটা কৌশল করিল যে, অতি সহজেই কার্য্য সিদ্ধ হইল।

সরলপ্রাণ কুলীরা সকলে মেলিয়া কিশোরকে খুব বাহবা দিল, এমন কি, তাহার প্রতি তাহাদের একটা শ্রদ্ধার ভাবও জাগিয়া উঠিল। সেই হইতে কিশোর যে কেমন করিয়া কারখানার কুলীদের দলে ভিড়িয়া গেল, তাহা সে নিজেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না।

( ২ )

কিশোর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কুলীদের সঙ্গে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিত, সন্ধ্যায় তাহার ছুটী। এ ছুটী যে তাহার পক্ষে সুখকর কি দুঃখকর, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। সমস্ত দিন বরং কাজের মধ্যে ডুবিয়া সে তাহার হৃদয়ের বেদনা ভুলিয়া থাকিত, কিন্তু সন্ধ্যার পর আবার তাহা জাগিয়া উঠিত। তাহার সঙ্গীদের সঙ্গেও এই সময়টা মেশা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, কেননা কয়েক দিনের মধ্যেই যাহা সে দেখিল, তাহাতে

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। সকালবেলা সে যাহাদের উৎসাহী ও পরিশ্রমী দেখিত, সারাদিন অশ্রান্ত কার্য্যের মধ্য দিয়াও যাহাদের সঙ্গে সে হাস্য পরিহাসে কাটাইত,—তাহাদেরই সন্ধ্যাবেলা ঠিক নূতন মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইত। তাহারা আর তখন মানুষ থাকিত না, একেবারে পশুতে পরিণত হইত। আর এই পশু তৈরী করার কল, কারখানার অদূরে সদর রাস্তার মোড়েই ছিল। এখানে যে তরল বিষ বিক্রয় হইত, তাহারা সারাদিনের নিষ্পেষণের যন্ত্রণা ভুলিবার জন্যই বোধ হয় তাহা পরম আগ্রহে গলাধঃকরণ করিত। প্রতি সপ্তাহে শনিবার ছিল কারখানা হইতে কুলীদের মাহিনা দিবার দিন। সেদিন সুরার দোকানে মহোৎসব লাগিয়া যাইত। হতভাগ্যেরা এক সপ্তাহের মজুরীর অধিকাংশই জমা দিয়া জ্ঞানহারা উন্মাদ সাজিবার অধিকার ক্রয় করিত। তাহাদের পত্নী কন্যারা আসিয়া শুষ্কমুখে, ব্যাকুল নেত্রে, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে পথ পার্শ্বে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। হায়, তাহারা যে কাল হইতে অনাহারে আছে, শিশুদের পেটে এক ঝিনুক দুধও হয়ত পড়ে নাই; আজ যদি হতভাগারা মজুরীর সব টাকাটাই শুঁড়ীর চরণে সমর্পণ করিয়া যায়, তবে তাহারা বাঁচিবে কিরূপে, শিশুদেরই বা বাঁচাইয়া রাখিবে কিরূপে?

কিশোর কতদিন বেদনাপ্লুত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া সেই বীভৎস করুণ দৃশ্য দেখিত, আর ভাবিত,—হায় ভগবান এদের এমন মতিগতি কেন? ইহার উত্তরে ভগবানের কি বলিবার আছে জানি না, কিন্তু কুলীরা স্বাভাবিক অবস্থায় এই কথা শুনিলে হয়ত ললাটে করস্পর্শ করিয়া বলিত,—"সবই কপাল রে ভাই, আমরা কি আর সাধ করে ওই বিষ খাই, না খেয়ে যে পারিনে, কে যেন টুঁটি চেপে ধরে দোকানের দিকে নিয়ে যায়।"

কিশোর ভাবিত—কিন্তু ভাবিয়া কোন কূলকিনারা পাইত না। শেষে এ চিন্তা অসহ্য হইলে বস্তী ছাড়িয়া গঙ্গার কূলে নির্জ্জনে যাইয়া বসিয়া থাকিত।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কুলী বস্তীর এক কোণে একটা খালি ঘর পড়িয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন কুলী সে ঘরে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। কেহ বলিত, সে অনাহারের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া ইহলোকের কারাগারকে এই ভাবে ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছিল; আবার কেহ কেহ বলিত, অতিরিক্ত মদ খাইয়া লোকটার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তাই সে মৃত্যুর ওই অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে দুইদলে যতই মতভেদ থাক, একটা বিষয়ে তাহারা সকলেই একমত ছিল। অপঘাত মৃত্যুর ফলে কুলীটা যে অপদেবতা হইয়া ঐ ঘরের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল, এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। বস্তীর দুই একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক শপথ করিয়া বলিতে পারিত যে, তাহারা মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মাকে জ্যোৎস্না রাত্রে সাদা কাপড় পরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে। দুই একজন প্রবীণ লোক আবার প্রচার করিয়া দিয়াছিল যে, ভিখারী ( মৃত কুলীর নাম ) একদিন রাত্রে তাহার নিকট এক গেলাস মদ ভিক্ষা করিতে করিতে শুঁড়ীর দোকান পর্য্যন্ত গিয়াছিল, শেষে সে নিরুপায় হইয়া 'রাম রাম' বলিয়া চীৎকার করাতে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল। বালকেরা বলিত যে, ঠিক দিবা দ্বিপ্রহরে তাহারা খেলিতে যাইয়া ঐ ঘরে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়াছে। এই সমস্ত কথা প্রচারের ফলে ঘরটার নামই হইয়া গেল 'ভূতের ঘর'। 'ভূতের ঘর' বহুদিন পর্য্যন্ত খালি পড়িয়াই ছিল, কেহই ভাড়া লইত না। কিশোর যেদিন বস্তীতে আসিয়া বাছিয়া বাছিয়া ঐ ঘরটাই দখল করিয়া বসিল, তখন সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, তাহাকে এই দুঃসাহসের কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক

চেষ্টা করিল,—কিন্তু কিশোর কোন অনুরোধ উপরোধেই কর্ণপাত করিল না,—শুধু মৃদু হাসিয়া বলিল, "মরা ভূত জ্যান্ত ভূতের কি করবে ?"

শীঘ্রই প্রচার হইয়া গেল কিশোর ভূতসিদ্ধ পুরুষ অথবা ভূত প্রেত পিশাচদের সঙ্গে তাহার আনাগোনা, গোপনে কথাবার্ত্তা চলে। এই সিদ্ধান্তটা আরও পাকা হইল, লোকে যখন দেখিল যে, কিশোর রাত্রে গঙ্গার কুলে, শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং বস্তীর কুলীদের কাছে, সে একজন অদ্ভুত রহস্যময় মানুষ হইয়া দাঁড়াইল। কেহই তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া মিশিত না, ছেলেরা তাহাকে ভীতি বিস্ময় মিশ্রিত চক্ষে দেখিত। স্ত্রীলোকদের বিশ্বাস হইল যে, সে একজন মস্ত গুণী ওস্তাদ, অনেক রকম মন্ত্র তন্ত্র তুকতাক তাহার জানা আছে, সুতরাং বিশেষ বিপদে পড়িলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেকে তাহার শরণাপন্ন হইত। কিশোর হাসিত, কিছু বলিত না। তবে সম্ভব হইলে প্রাণপণে বিপন্নের উপকার করিতে চেষ্টা করিত।

একখানি মাত্র খোলার ঘর, মাটির দেয়াল,—তাহার কোন দিক দিয়া আলো বাতাস প্রবেশের পথ নাই। এত অপ্রশস্ত যে, একজন মানুষ ভাল করিয়া লম্বা হইয়া শুইতেও পারে না। উহারই একপাশে, যেদিন ইচ্ছা হইত, কিশোর ইঁট পাতিয়া রাঁধিয়া খাইত। অন্যদিকে উপাধানরূপে একখানা ইঁট মাথায় দিয়া শুইত। বস্তীর সব ঘরই ঐ রকম; উহাই কুলীদের জন্য, কারখানার মালিকদের রচিত 'নন্দন কানন'। যাহাদের স্ত্রীপুত্র আছে, তাহারা যে এইরূপ ঘরে কিরূপে বাস করে, তাহা অনুমানেই বুঝা যাইতে পারে। আদিম মানবেরা পর্ব্বত গুহায় যখন বাস করিত, তখন তাহারাও নিশ্চয়ই এর চেয়ে আরামে থাকিত। আজ মানবজাতি নাকি খুবই সভ্য হইয়াছে, উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে,—

কিন্তু মনুষ্য সমাজের বারো আনা, দরিদ্র কৃষক শ্রমিক মজুরের দল—সেই আদিম পর্ব্বতগুহার গণ্ডী কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

কলকারখানার নিকটেই যে সব কুলীবস্তী গড়িয়া উঠে, সেগুলাকে পল্লী, গ্রাম বা পাড়া কোন পর্য্যায়েই বোধ হয় ভুক্ত করা যায় না। যেসব গ্রাম বা পল্লী স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে, তাহার অন্তরালে তবু একটা প্রাণ শক্তি থাকে, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সেখানে একই পারিপার্শ্বিক সমাজের বন্ধনে একত্র হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠে ;—জমিদাব, প্রজা, কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী, এদের পরস্পরের মধ্যে একটা হৃদয়ের যোগ সূত্র থাকে, পরস্পরের সুখদুঃখে অনেক সময় তাহার সহানুভূতিও প্রকাশ করে। কিন্তু সহরে কল-কারখানার আশেপাশে যেসব বস্তী গড়িয়া উঠে, তাহার চারিদিকে একটা কৃত্রিম আবহাওয়া,পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্বন্ধের সেখানে একান্ত অভাব। এই বস্তীতে জীবনসংগ্রামের তাড়নায় যাহারা আসিয়া ঘর বাঁধে, তাহারা অধিকাংশস্থলেই পথচারী পথিকের মত, পরস্পরের সঙ্গে অপরিচিত। কাজেই তাহাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন বা নীতির বন্ধন বড় একটা থাকে না। সর্ব্বপ্রকার অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম—সহজেই এই সব স্থানে প্রশ্রয় পায়। এই হিসাবে কুলীবস্তীগুলি আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ, সমাজ জীবনের বিকৃতি, মনুষ্যত্বের রসশোষণকারী।

যাহারা কলকারখানার মালিকরূপে এই হতভাগ্য কুলীদের রস রক্ত শোষণ করিয়া জলোকার মত পুষ্ট হইতেছে, তাহাদের ক্ষুধার সীমা নাই। তাহাদের লালসার প্রচণ্ড অনলে নারীদেহ পর্য্যন্ত আহুতি পড়ে এবং হতভাগ্যগণকে অনেক স্থলে স্ত্রীকন্যার যৌবন দিয়া রাক্ষসের পিপাসা শান্ত করিতে হয়। কিন্তু হায়, প্রতিনিয়ত আঘাতে আঘাতে তাহাদের প্রাণ এমন অসাড় হইয়া পড়ে, মনুষ্যত্বের সম্মান, নারীত্বের মর্য্যাদা—এই সব ক্ষুধাতুর অর্দ্ধ নর, অর্দ্ধ পশুদের নিকট এমনই মূল্যহীন হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহারা

অসীম দুর্দ্দশার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়াও নিজেদের অবস্থা ভাল করিয়া উপলব্ধি পর্য্যন্ত করিতে পারে না বা করিবার সাহসও পায় না।

( ২ )

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। ঘোর অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন; কুলীবস্তী নীরব, সারাদিনের ক্লান্তির পর সেখানকার অধিবাসীরা শয্যার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পথে লোক চলাচল বন্ধ হইয়াছে। কিশোরের চক্ষে কিন্তু নিদ্রা নাই। সে এই নীরব নির্জ্জন অন্ধকারে ভূমি শয্যায় শুইয়া অন্যদিনের মত আজও তাহার ব্যর্থ দগ্ধ জীবনের কথা ভাবিতেছে। তাহার স্নেহময়ী জননী সত্যই তিনি আর ইহলোকে নাই। তাঁহার সোনার দেহ গঙ্গার অতল গর্ভে সমাধিস্থ হইয়াছে। একথা ভাবিতে কিশোরের সমস্ত হৃৎপিণ্ড মথিত করিয়া একটা হাহাকার উঠিল। হায়, তাহার দুঃখিনী জননী, কোনদিনই তো তিনি সুখ শান্তি কাহাকে বলে, তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই! তাহার দরিদ্র পিতাকে সকলেই নিন্দা করিত, কিন্তু অসহ্য দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশাই তাঁহার জীবনের অভিশাপ স্বরূপ ছিল নাকি? সমাজ তাঁহাকে মাতাল চরিত্রহীন বলিয়া ঘৃণা করিত, তাঁহার স্পর্শ এড়াইয়া চলিত, কিন্তু সেই সমাজই তাঁহার দুর্দ্দশার জন্য দায়ী নহে কি? যদি তিনি দুশ্চরিত্র ও মাতাল হইয়াও ধনী হইতেন, তবে সমাজের বুকের উপরে সগর্ব্বে বসিয়া কি হুকুম করিতে পারিতেন না? কত দুশ্চরিত্র মাতাল, কেবল তাহাদের পৈতৃক ধন বলেই সমাজের শাস্তারূপে, গণ্যমান্য লোক বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছে! আর তাহার দরিদ্র পিতা অনাহারে একমুষ্টি অন্নের জন্য অপঘাতে মরিলেন, কেহ তাঁহার মৃতদেহের সৎকারে পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র সাহায্য করিল না। কি নির্ম্মম অত্যাচার, কি পৈশাচিক হৃদয় হীনতা! কিশোরের যদি সাধ্য থাকিত,

তবে সে এই সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিত। কিন্তু হায়, তাহার কোন সাধ্য নাই, সে একান্ত নিরুপায়, অসহায়,—সমাজই প্রবল দৈত্যের মতো তাহার অস্থি মজ্জা চূর্ণ করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। কেবল সে কেন, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ নরনারী—এই দৈত্যের পেষণে পিষ্ট হইতেছে। তাহারাও কিশোরের মতোই অসহায়! কেন এই অন্যায়, অত্যাচার, নির্য্যাতন? এই যে কতকগুলি লোক টাকার কাঁড়ি লইয়া বিলাস ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া আছে, আর ঐ মুষ্টিমেয় লোকের বিলাসের, ভোগসুখের উপাদান যোগাইতে সহস্র সহস্র লোক সর্ব্বস্ব আহুতি দিতেছে, এ কেমন বিধান! কেন সে এই অনিয়ম ব্যভিচার আর দশজনের মত নীরবে মাথা পাতিয়া লইবে? না—কিছুতেই সে এ অন্যায় মানিবে না! সে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে, দানবের ভ্রূকুটী কুটীল দৃষ্টিতে কিছুতেই সে ভীত হইবে না! ভয়ই বা কিসের তাহার? কি আছে তাহার? জীবন?—সে তো অতি তুচ্ছ!—

এমন সময় দরজায় করাঘাতের শব্দ হইল, কিশোর চমকিতভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল—"কে?"

ভয় কম্পিত ব্যাকুল কণ্ঠে উত্তর হইল—"আমি জনার্দ্দন—দরজাটা খোল না একবার—"

"কে জনার্দ্দন দাদা?—এত রাত্রে যে"—বলিতে বলিতে কিশোর উঠিয়া দরজার খিল খুলিয়া দিল।

জনার্দ্দন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখনও ভয়ে কাঁপিতেছিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, দুশ্চিন্তায় চোখ দুটা যেন বসিয়া গিয়াছিল;—সে ঘন ঘন হাঁপাইতেছিল, যেন সমস্ত পথ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছে।

কিশোর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জনার্দ্দনের দিকে চাহিয়া বলিল— "একি জনার্দ্দন

দাদা, কি হয়েছে তোমার? পথে ভূত দেখেছ নাকি?”—কিশোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঈষৎ ঈষৎ হাসিল।

জনার্দ্দন তখনও হাঁপাইতেছিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে কিছুক্ষণ কোন উত্তর দিতে পারিল না। তারপর অনেক কষ্টে, অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, চারিদিকে সভয়ে চাহিয়া, সে যাহা বলিল—তাহার সারমর্ম্ম এই।

জনার্দ্দন জাতিতে বাগ্‌দী। প্রায় একমাস হইল সে মেদিনীপুরের গ্রাম ছাড়িয়া এখানকার কারখানায় কুলীর কাজে আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছে। সঙ্গে তাহার একমাত্র মাতৃহীনা কন্যা লক্ষ্মী, বয়স ১৫।১৬ বৎসর। লক্ষ্মী সত্যই লক্ষ্মী, বাগ্‌দীর মেয়ে হইলেও সে যেন গোবরে পদ্মফুল; উদ্ভিন্নযৌবনা লক্ষ্মীর রূপ অতুলনীয়, একবার চাহিলে দৃষ্টি ফিরানো যাইত না। কিন্তু এই রূপই লক্ষ্মীর কাল হইল, গরীব কুলীর মেয়ের এত রূপ সহ্য হইবে কেন? জনার্দ্দন একাই কারখানায় খাটিত, লক্ষ্মীকে সে কোন দিন কারখানায় লইয়া যাইত না। লক্ষ্মীও বড় একটা ঘরের বাহির হইত না, কেবল সকাল সন্ধ্যায় তাহাকে জল আনিতে যাইতে হইত। বস্তীর কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল যুবকের দৃষ্টি লক্ষ্মীর দিকে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বিশালকায় জোয়ান জনার্দ্দনের চেহারা মনে পড়িলেই, তাহাদের সাহস লুপ্ত হইত।

জনার্দ্দনের দুর্ভাগ্যক্রমে লক্ষ্মীর রূপের খ্যাতি বস্তীর কুলী যুবকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না। শীঘ্রই ম্যানেজার সাহেবের কাণেও তাহা প্রবেশ করিল। বড় সাহেবের নারীশিকার সংগ্রহ করিবার কয়েকটী বাহন ছিল, তাহারাই এই অমূল্য সংবাদটী তাঁহাকে জানাইয়াছিল। কয়েকদিন পরেই বড়সাহেবের বাংলাতে সন্ধ্যাবেলা জনার্দ্দনের ডাক পড়িল। সাহেব তখন সুরার প্রসাদে বেশ খোসমেজাজে ছিলেন। ঈষৎ জড়িত স্বরে, আধা বাংলা আধা হিন্দীতে বলিলেন—

"জানারডোন, তোমারা-পর হামি বড় খুসী আছে। টুমি কেত তলব পাও ?"

জনার্দ্দন আভূমি প্রণতঃ হইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—"হুজুর, আমি গরিব, মাত্র দশটাকা মজুরী পাই—"

"আচ্ছা তোমারা বিশ রূপেয়া মিলেগা।"

জনার্দ্দন কৃতকৃতার্থ হইয়া আর একবার সাহেবকে সেলাম করিল ; তাহার মনে হইল, সাহেব সাক্ষাৎ দেবতা, গরিবের উপর কি দয়া !

দেবতা একটু পরে হাসিয়া বলিলেন—"তোমরা একটো খাপসুরৎ জোয়ান লেড়কী আছে—লখ্—মী—?"

বিশালকায় জনার্দ্দনের বুক কাঁপিয়া উঠিল, কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল—"হাঁ হুজুর, সে নেহাত ছেলেমানুষ, তাকে কারখানার কাজে দেব না—"

সাহেব দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল—"কারখানাকা কাম নেহি, খাস হামারা কাম কোরবে ;—ও বহুত খাপসুরৎ লেড়কী হ্যায়—"

জনার্দ্দনের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, সে অতি ভয়ে ভয়ে বলিল,—"ও যে ঘরের বাহির হয় না হুজুর—!"

সাহেব রুষ্ট হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"হামারা সাথ বেয়াদবী !—লেড়কীকো জরুর লে আনে হোগা—আবি যাও—"

জনার্দ্দন তবু দুঃসাহসে ভর করিয়া বলিল—"না হুজুর, সে আসবে না।"

সম্মুখ হইতে কেহ শিকার ছিনাইয়া লইলে, বাঘ যেমন আক্রোশে গর্জ্জন করিয়া উঠে, সাহেবও তেমনি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া হাঁকিল—"জমাদার !"

এক ভীষণ দর্শন হিন্দুস্থানী আসিয়া সেলাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। সাহেব তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

"হরনাম সিং, এ বহুত শয়তান আদমী হ্যায়, উসকা তলব হাম ডবল কর দিয়া, তব—ভি— !"

তার পর জনার্দ্দনের দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"যাও ইসকো ঘর সে লে যাও,—আউর উসকো লেড়কীকো—"

সাহেব টেবিল হইতে পানপাত্র লইয়া এক চুমুকে তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

তাহার পর জনার্দ্দন যাহা বলিল, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। জমাদার ও পাইকেরা তাহার হাত পা বাধিয়া তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল এবং তাহার সম্মুখেই লক্ষ্মীকে জোর করিয়া লইয়া আসিল। লক্ষ্মী ভীতিব্যাকুল নেত্রে হরিণ শিশুরই মতো জনার্দ্দনের দিকে চাহিয়াছিল। কিন্তু জনার্দ্দন পিতা হইয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। লক্ষ্মী চীৎকার করিল না, কাঁদিল না, কেবল জমাদারের পায়ে পড়িয়া অশ্রুজলে ভূমিতল সিক্ত করিল। কিন্তু তাহারা তো মানুষ নয়, প্রাণহীন পাষাণ মাত্র,—তাহারা একটুও নরম হইল না, টলিল না,—জোর করিয়া ৪।৫ জনে মিলিয়া লক্ষ্মীকে ধরিয়া লইয়া গেল। জনার্দ্দন কোন রকমে বাঁধন ছিঁড়িয়া বস্তীর মধ্যে ছুটিয়া গিয়াছিল, সকলের পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়াছিল। কিন্তু কেহই তাহার করুণ আবেদনে বুকফাটা ক্রন্দনে কর্ণপাত করে নাই। কেহ কেহ বরং বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছে—"তোর মেয়ে কি আর সকলের চেয়ে কুলীন? কারখানায় কুলীর কাজ করতে এসে অমন হয়েই থাকে, রোজই হচ্ছে!"

জনার্দ্দনকে এইরূপে সকলেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাই সে অবশেষে কিশোরের নিকট নিরুপায় হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। কিশোর ভূতসিদ্ধ পুরুষ, মন্ত্রতন্ত্র জানে, সে কি একটা কিছু করিয়া তাহার মেয়েকে উদ্ধার করিতে পারে না? এতক্ষণে হয়ত—। বলিতে বলিতে জনার্দ্দন বালকের মতো হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

---

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কিশোর জনার্দ্দনের কাহিনী শুনিয়া কিছুক্ষণ বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তাহার সমস্ত শরীরে শিরায় শিরায় কে যেন আগুন জ্বালাইয়া দিল। এও কি সম্ভব?—অসহায়া নারীর উপর এই পৈশাচিক অত্যাচার,—মানুষে কি ইহা করিতে পারে? কিশোর পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিল,—"কেউ তোমাকে সাহায্য করলে না জনার্দ্দন?—বস্তীতে এতগুলা মরদ, কেউ লক্ষ্মীকে রক্ষা করতে পারলে না?"

কিশোরের অবস্থা দেখিয়া জনার্দ্দনেরই মনে ভীতির সঞ্চার হইল। সে ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে বলিল—"না, ভাই, কেউ এগুলো না ত—"

"জনার্দ্দন, জনার্দ্দন, ভগবানের রাজ্যে এত অনিয়ম, এ তো আর সহ্য হয় না। চল, আজ আমিই তোমার লক্ষ্মীকে উদ্ধার করবো। আমি ভূতসিদ্ধ নই। কিন্তু বিশ্বের যত ভূত প্রেত পিশাচ দানব আছে, তাদের শক্তি আজ আমি কেড়ে নেবো।"

কিশোর তাহার মোটা লাঠী গাছটা লইয়া এক লম্ফে ঘর হইতে বাহির হইল এবং ঝড়ের বেগে রাস্তা দিয়া ছুটিল। জনার্দ্দন অতি কষ্টে তাহার অনুসরণ করিল।

ম্যানেজার সাহেবের বাংলা কারখানা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে গঙ্গার ধারে। সম্মুখে প্রকাণ্ড ছাতা, দুই পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান; জ্যোৎস্না রাত্রে গঙ্গাবক্ষে যখন সমস্ত বাড়ীখানির প্রতিবিম্ব পড়িয়া তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে থাকে, তখন তাহা ছায়া চিত্রের ছবির মতই সুন্দর দেখায়। এই ইন্দ্রপুরী তুল্য সুন্দর ভবনে যাহারা বাস করে, তাহারা এমন বীভৎস কেন? তাহাদের হৃদয় এমন কুৎসিত কেন?

কিশোর ও জনার্দ্দন যখন হাতার নিকটে পৌঁছিল, তখন চারিদিক নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, বাড়ীতে কোন লোক আছে বলিয়া মনে হয় না। বাহিরের সমস্ত আলো নির্ব্বাপিত, কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই। কেবল দক্ষিণ কোণের একটা ঘর হইতে আলোর শিখা বাহির হইতেছিল। জনার্দ্দনের মনে হইল, ঐ ঘরেই তাহার লক্ষ্মীকে লইয়া গিয়াছে, সে যেন কাণে লক্ষ্মীর চাপা ক্রন্দনের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইল। হায় হায়,—এতক্ষণে —!

জনার্দ্দন ব্যাকুলভাবে বলিল—"কিশোর, কিশোর!"

কিশোর ততক্ষণে ফটকের ঠিক সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফটক বন্ধ—অত্যন্ত নির্ম্মমভাবে বন্ধ, তাহার কোথাও একটু ছিদ্র বা ফাঁকও বোধ হয় নাই। কিশোর চীৎকার করিয়া হাঁকিল—দরজা খোল—দরজা খোল। কিন্তু তাহার চীৎকার গঙ্গাবক্ষে দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইল মাত্র, কেহই কোন সাড়া দিল না,যেন সমস্ত বাড়ীটা মূর্ত্তিমান 'অত্যাচারের মতো তাহার বিফল চেষ্টার প্রতি উপহাস করিতে লাগিল। কিশোর তাহার মোটালাঠী দিয়া ফটকের দরজায় ঘন ঘন প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু ফটকের সেই বিপুলায়তন কবাট বিন্দুমাত্রও টলিল না, কম্পিত হইল না।

কিশোর উন্মত্তের মত আঘাতের পর আঘাত করিতে লাগিল। কতক্ষণ এরূপ আঘাত করিয়াছিল, তাহা সে জানে না। হঠাৎ তাহার মনে হইল, জনার্দ্দন তো বলিয়াছে, সে ভূতসিদ্ধ পুরুষ। সত্যই কি 'ভূত' বলিয়া কিছু আছে? কই, শ্মশানে শ্মশানে তো সে অনেক বেড়াইয়াছে, কোনদিন কোন ভূতপ্রেত তো তাহাকে দেখা দেয় নাই বা তাহার সঙ্গে কথা বলে নাই! সত্যই যদি সেই অদৃশ্য আত্মাদের অস্তিত্ব থাকে, যদি সে তাহাদের সাহায্য চায়, তবে কি তাহারা আসিবে? মানুষের ডাকে মানুষ সাড়া দেয় না, ভূতেরা কি সাড়া দিবে? হয়ত দেয়,

হয়ত ভূতেরা জ্যান্ত রক্তমাংসের মানুষের মতো হৃদয়হীন নহে! কিশোর শ্মশানের দিকে ছুটিয়া চলিল। জনার্দ্দন বিমূঢ়ের মত সেই ফটকের বাহিরেই বসিয়া পড়িল।

গঙ্গাতীরের বড় শ্মশান বেশী দূরে নহে। কিশোর শ্মশানের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, বটগাছের তলে একটা আলো জ্বলিতেছে, আর কতকগুলি ছায়ামূর্ত্তি সেই আলোর চারি ধারে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। আলো আঁধারে সেই ছায়ামূর্ত্তিগুলি ঠিক প্রেতের মতোই দেখাইতেছিল। কিশোর ভাবিল, ইহারাই কি শ্মশানচারী ভূতের দল? এত রাত্রে আর কাহারা শ্মশানে জটলা করিবে? ইহারা কি আমার আহ্বানে সাড়া দিবে? কিশোর আরও নিকটে গিয়া দেখিল—না, তাহারা তো ঠিক রক্তমাংসেরই মানুষের মত! তবে কি এরা ডাকাত?

কিশোর চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো, তোমরা কে,—আমার কথা শোন—"

শ্মশানচারীরা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। একজন একটা মশাল জ্বালাইয়া লইয়া কিশোরের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল, আর একজন বজ্র মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিকৃতস্বরে বলিল,—"কে তুই—কি চাস এখানে?—তোর কি মরতে ইচ্ছে হয়েছে?"

আর একজন বলিল—"এই কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী রাত্রে তুই এই শ্মশানে ভূতের এলাকায় এসেছিস, তোর কি প্রাণে ভয় নেই?"

কিশোর কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ভয় কি? আজ সেতো এই শ্মশানচারী ডাকাতদের কাছেই আসিয়াছে? প্রকাশ্যে বলিল—"না, ভয় কাকে বলে, আমি জানি নে! আমি চাই, তোমাদেরই কাছে ভিক্ষা। আগে বল, তোমরা কি অন্য মানুষেরই মতো হৃদয়হীন, না, তোমাদের কিছু দয়ামায়া আছে?"

একজন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল "পাগল—পাগল,—ওকে ছেড়ে দে।"

যাহার হাতে মশাল ছিল, সে ভাল করিয়া কিশোরের মুখ ও সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"না না, ওর কথা শুনতে দে। বল, কি চাও তুমি! মিথ্যা কথা বল্‌লে, বা চালাকী করলে, তোমার নিস্তার নেই।"

কিশোর তখন এক নিঃশ্বাসে লক্ষ্মীর হৃদয় বিদারক কাহিনী বলিল। বলিতে বলিতে ক্রোধে তাহার কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল, চক্ষু জ্বলিতে লাগিল, হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হইল। ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া সে কহিল—

"কোনও মানুষ এই কাতর আহ্বানে সাড়া দেয় নাই! এখন আমি জানতে চাই, তোমরাও কি জড়পিণ্ড, হৃদয়হীন? নারীর কাতর আহ্বানে তোমরাও কি সাড়া দেবে না, তার ধর্ম্ম রক্ষা করবে না? বল, বল, আর একমুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়!"

শ্মশানচারীরা একথার কোন উত্তর না দিয়া সকলে একসঙ্গে লাফাইয়া উঠিল। মশালধারী প্রবল ধাক্কায় কিশোরকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল,—"চল, পথ দেখিয়ে আগে চল।"

আগে আগে কিশোর ছুটিতে লাগিল, তারপরে মশালধারী, তৎপশ্চাতে অন্যান্য সকলে তাণ্ডবনৃত্য করিতে করিতে চলিল। সেই কৃষ্ণ পক্ষের অন্ধকার নিশীথে যদি সে দৃশ্য কেহ দেখিত, তবে নিশ্চয়ই মনে করিত, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্য নন্দীভৃঙ্গীর দল যাত্রা করিতেছে।

( ২ )

জনার্দ্দন কতক্ষণ ফটকের নীচে বিমূঢ়ভাবে পড়িয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ মশালের তীব্র আলো চোখে লাগিয়া, এবং বহু মানুষের পদশব্দ শুনিয়া, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া গেল, সর্ব্বশরীরে

রক্তস্রোত বন্ধ হইল। সে বুঝিল, ভূত সিদ্ধ কিশোর, শ্মশান হইতে ভূতের দলকেই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সত্যই যে শ্মশানের ভূতের দলকে এমন ভাবে সম্মুখে দেখিতে হইবে, তাহা সে স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। জনার্দ্দন ভয়ে চীৎকার করিতেও পারিল না, তাহার হাত পা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিশোর তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—"ভয় নাই জনার্দ্দন, তোমার মেয়ে কোথায় ?"

জনার্দ্দন কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু হাত দিয়া, বাংলার যে দিকে আলোর শিখা দেখা যাইতেছিল, সেই দিকে দেখাইয়া দিল। চক্ষের নিমিষে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। একজন দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি এক লম্ফে উচ্চ প্রাচীরের উপর উঠিয়া পড়িল, এবং ভিতরে নামিয়া ফটকের দরজা খুলিয়া দিল। তারপর সকলে মিলিয়া "রে—রে—রে—রে" শব্দ করিতে করিতে বাংলার দিকে ছুটিল। কেবল একজন ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল, আর তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল জনার্দ্দন !

( ৩ )

বাংলোর একটী কক্ষের মেজেতে লক্ষ্মী মূর্চ্ছিতা, একজন বর্ষীয়সী রমণী তাহার পাশে বসিয়া বাতাস করিতেছে, মাঝে মাঝে মুখে চোখে জলের ছিটা দিতেছে। কক্ষের দ্বারদেশে সেই হিন্দুস্থানী জমাদার দাঁড়াইয়া নীরবে চাহিয়া আছে।

স্ত্রীলোকটী উঠিয়া আসিয়া জমাদারকে মৃদুস্বরে বলিল—"এখনও তো জ্ঞান হলো না, বেচারা ভয়েই মূর্চ্ছা গিয়েছে। তোমাদের কি দয়ামায়া নেই, বাপু—"

জমাদার মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"কি ক'রবো আমি,

আমরাও পাষাণ নই, কিন্তু হুকুমের চাকর আমরা, আমাদের তো ভালমন্দ বিচার করবার জো নেই।"

"কিন্তু তাই বলে কি মরা মানুষকে নিয়ে টানাটানি ক'রবে জমাদার সাহেব? সাহেবকে বুঝিয়ে বল—"

জমাদার সভয়ে দুইহাত পিছাইয়া গিয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ, তাহ'লে কি আর রক্ষা থাকবে! ভাগ্যে সাহেব মদে চুর হয়ে আছে, তাই এতক্ষণ তলব পড়েনি। একটু হুঁস হলেই—"

বৃদ্ধা কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় লক্ষ্মী সহসা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, চারিদিকে সভয়ে চাহিয়া বলিল—"এ আমি কোথায় এসেছি, আমার বাবা কোথায়?" তারপরে জমাদারের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"জমাদার সাহেব, আমি তোমার মেয়ে, আমাকে বাড়ীতে রেখে এস—"

জমাদার কোন উত্তর দিল না, কথাটা না শুনিবার ভান করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

লক্ষ্মী উন্মত্তের মতো ছুটিয়া আসিয়া জমাদারের পা জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল—"আমাকে রক্ষা কর জমাদার সাহেব, তোমারও তো মেয়ে আছে, তার কথা মনে ক'রে—"

জমাদার কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় পার্শ্বের কক্ষ হইতে ভারী মোটা গলায় আওয়াজ আসিল,— "জমাদার—জমাদার—"

মুহূর্ত্তের মধ্যে জমাদারের সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বাঘ যেমন বন্যহরিণীকে সহসা থাবা পাতিয়া ধরিয়া ফেলে, তেমনি সে লক্ষ্মীকে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরিল এবং তাহাকে শূন্যে উত্তোলন করিয়া সাহেবের কক্ষের দিকে ছুটিল।

নখাঘাতে বিদীর্ণকণ্ঠ হরিণীর মতোই লক্ষ্মী ছটফট করিতে লাগিল। আর তো পরিত্রাণ নাই, এখনই তো রাক্ষসের কবলে তাহাকে উৎসর্গ করিবে।—এইবার—সাহেবের কক্ষের দ্বারদেশে। হায়, ভগবান কি নাই? তাঁহার রাজ্যে কি দয়ামায়া নাই? এই বিশাল বিশ্বে লক্ষ্মীর কাতর আহ্বান শুনিবার কি কেহ নাই?

* * * * *

সহসা 'রে—রে—রে—রে' শব্দে অগণ্য-লোক জলস্রোতের মতো সেখানে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলের অগ্রে মশালধারী,—মশালের তীব্র আলোকে সেই গভীর নিশীথে তাহার মূর্ত্তি অতি ভীষণ দেখাইতেছিল। জমাদারের দিকে তর্জ্জনী হেলাইয়া জলদগম্ভীর স্বরে সে বলিল—"আর একপা এগুলে তোর ধড়ে মাথা থাকবে না, খবরদার—"

জমাদার অস্ফুটকণ্ঠে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই চক্ষের নিমিষে একজন লক্ষ্মীকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল।

জমাদার অনেক কষ্টে ভীতিবিজড়িত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ডাকু—ডাকু, সাহেব,—ডাকু!"

ভীষণ গোলমাল ও চীৎকারে সাহেবের নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল। সে টলিতে টলিতে কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া হাঁকিল—"পাকড়ো, পাকড়ো, ডাকু লোক্‌কা, থানামে খবর দেও—"

মশালধারী সাহেবের দিকে একবার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে একটা পিস্তল বাহির করিয়া সাহেবের ললাট লক্ষ্য করিয়া তুলিল।

সাহেব ভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া দ্রুতবেগে কক্ষমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

ডাকাতের দল 'রে—রে—রে—রে' শব্দে গগন বিদীর্ণ করিয়া আবার শ্মশানের দিকে ছুটিল।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অনিন্দিতার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কেননা মোহিতের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যাইবার সময় মোহিত বলিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা সুন্দরবনে শিকার করিতে যাইতেছে, এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু একমাস অতীত হইয়া গেল, কোন খবরই মোহিতের নিকট হইতে আসে নাই। দাদার উপর অনিন্দিতার মনে মনে খুবই রাগ হইতেছিল। দাদা না হয় তাহার কথা নাই মনে করিল, কিন্তু বুড়া মার জন্যও কি দাদার কোন ভাবনা নাই ?

শ্যামমোহিনী আসিয়া ডাকিলেন,—"অনি !"

"কি মা ! তোমার শরীরটা এখন কেমন আছে, আজও রাত্রে ঘুম হয় নি বুঝি ?—" বলিয়া অনিন্দিতা উদ্বিগ্নভাবে মায়ের মুখের দিকে চাহিল।

শ্যামমোহিনী ম্লানভাবে হাসিয়া বলিলেন,—"আমি বুড়ো মানুষ, আমার শরীরের জন্য তোর আর ব্যস্ত হতে হবে না। তোর দাদার কোন খবর পেলি ?"

"কোন খবর পাই নি মা"—পরক্ষণেই মায়ের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তবে মনে হচ্ছে শীগ্‌গীরই দাদা আসবে। জান তো দাদার কাণ্ড, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে, হয় ত জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করে বেড়াচ্ছে, বাড়ীর কথা একেবারেই ভুলে গেছে—।"

অনিন্দিতা লঘুভাবে হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মন তাহাতে মোটেই সায় দিল না।

শ্যামমোহিনী বলিলেন—"বিনোদ বল্‌ছিল, শ্রীক্ষেত্রে রথের এবার খুব ভিড় ; ছেলেরা সব দল বেঁধে যাত্রীদের সেবা করবার জন্য সেখানে

যাচ্ছে। মোহিতেরাও হয়ত সেখানেই গিয়েছে। শুনছি এরই মধ্যে পুরাতে খুব কলেরা আরম্ভ হয়েছে,—কি যে জগন্নাথের মনে আছে—।"

"তুমি ও-সব খারাপ ভাবনা ভেবে অনর্থক ব্যস্ত হয়ো না মা,—কলের জল থাকতে থাকতে মাথায় একটু জল দিয়ে নাওতো! আমি এখনি আসছি।"

শ্যামমোহিনী নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। অনিন্দিতা একখানি বই হাতে করিয়া রাস্তার ধারে জানলার নিকটে যাইয়া বসিল এবং তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বইয়ের অক্ষরগুলা তাহার নিকট দুর্ব্বোধ্য মনে হইতে লাগিল,—কাল কাল পিপীলিকার মতো তাহারা যেন সারি বাঁধিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে। অদূরে রাজপথে চাহিয়া দেখিল,—লোকজন, গাড়ীঘোড়া সব যেন বায়স্কোপের ছবির মত চোখের উপর দিয়া একটীর পর একটী অন্তর্হিত হইতেছে। ফেরিওয়ালারা হাঁকিয়া চলিয়াছে, কত রকম বেরকমের জিনিষ; পরক্ষণেই একজন পাগড়ী মাথায় হিন্দুস্থানী বেদিয়া ডুগডুগী বাজাইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে তাহার দুইটা বানর—ও একটা ছাগল, তাহার গলায় একটা ঘণ্টা টুং টুং করিয়া বাজিতেছে। এইবার একখানি ছ্যাকড়া-গাড়ী, তাহার মধ্যে একটী ঘোমটাপরা মেয়ে বসিয়া, পার্শ্বে একটী প্রিয়দর্শন যুবক। বোধ হয় যুবক তাহার নবীনা বধূকে লইয়া কোন দূর কার্য্যস্থানে চলিয়াছে। এইবার সাঁ করিয়া একখানি মোটগাড়ী চলিয়া গেল,—বলদৃপ্ত দৈত্যের মতো চারিদিক কম্পিত করিয়া। কয়েকজন সাহেব মেম তাহাতে বসিয়া হাসি ও গল্প জমাইয়া তুলিয়াছে। এমনি ভাবে বিজয়ীর মতো এরা এদেশের বুকের উপর দিয়া যায়। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। আর তাহারই পশ্চাতে ওই যে হন হন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে বাঙ্গালী বাবুর দল,—ওরা নিশ্চয়ই কেরাণী, ৯টার সময় নাকে মুখে কোনরূপে কিছু গুঁজিয়া আফিসযাত্রী ট্রাম ধরিতে ছুটিয়াছে। পান খাইয়া ঠোঁট

লাল করিলেও, চোখে মুখে চিন্তার রেখা লুকাইতে পারে নাই ; ঈষৎ কুব্জ পৃষ্ঠ—জগতের সমস্ত দুঃখের বোঝা যেন তাহাদের পিঠে চাপিয়া বসিয়াছে। অনিন্দিতা অন্যমনস্কভাবে ইহাদেরই কথা ভাবিতে লাগিল। এরা কি মানুষ, না ভারবাহী বলীবর্দ্দ ? কে এদের দুর্দ্দশার জন্য দায়ী ? দাদা বলিবে যে, জাতির পরাধীনতাই এর কারণ, দেশ স্বাধীন হইলে এরাই মানুষ হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইত। কিন্তু কথাটা কি সম্পূর্ণ সত্য ? যে সব দেশ স্বাধীন, সেখানেও কি এই শ্রেণীর নির্য্যাতিত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোক নাই ?—

এইবার আর একখানি ঠিকা গাড়ী আসিতেছে। গাড়ীখানি বেশ জোরেই আসিতেছে। কে ইহারা ? গাড়ীখানি কিন্তু চলিয়া গেল না, তাহাদের ফটকের নিকটেই আসিয়া থামিল। অনিন্দিতা ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল এবং প্রায় ছুটিয়া গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। ততক্ষণে গাড়ী হইতে একজন আরোহী নামিয়া পড়িয়াছে। অনিন্দিতা তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই, সে ছুটিয়া নিকটে আসিয়া বলিল— "এই যে অনি, ভাল আছিস, মা কেমন আছেন ?"

হঠাৎ বন্যার জল আক্রমণ করিলে নদীমধ্যস্থ স্নানরত ব্যক্তির যেরূপ অবস্থা হয়, অনিন্দিতারও ঠিক তাহাই হইল। সে আনন্দাতিশয্যে বিহ্বল বিব্রত হইয়া পড়িল, কি যে বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। একসঙ্গে আগ্রহ ও আনন্দের অভিব্যক্তিতে তাহার মুখে অপূর্ব্ব শোভা ফুটিয়া উঠিল। এই গোলযোগে অনিন্দিতা লক্ষ্য করে নাই যে, আর এক ব্যক্তি তাহার দাদার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মোহিত অনিন্দিতার দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিল—

"অনি, নরেশের সঙ্গে আর একজন কে এসেছে দেখেছিস ? এঁর নাম কিশোর ; ইনি অজ্ঞাতবাস করছিলেন, আমাদের কাছে ধরা দিয়েছেন।"

কিশোর মৃদু অনুযোগের স্বরে বলিল—"আঃ দাদা, আপনি যে অলঙ্কার ছাড়া কথাই বল্‌তে পারেন না! উনি কি মনে করবেন বলুন দেখি।"

অনিন্দিতা কিশোরের দিকে চাহিয়া দেখিল, আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। একি—এযে ছদ্মবেশী ইন্দ্র, অথবা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! বাহিরের ওই মলিন বেশ, ওটা যেন বাহ্য ছলনা। কিন্তু ওই উজ্জ্বল দীপ্ত চক্ষু, উন্নত ললাট এবং প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী,—কোন বাহ্য ছলনাতেই সে সব চাপা পড়িতে পারে না! হাত দুটী রমণীসুলভ কোমল নহে, কঠোর শ্রমের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান, কিন্তু তবুও তাহাকে চাষা বা মজুরের হাত বলা যায় না। কাঁধে একখানি মলিন চাদর, গায়ে জামা নাই, কিন্তু সুগঠিত দেহ ও প্রশস্ত বক্ষস্থল—বীর্য্য ও তেজস্বিতারই পরিচয় দিতেছিল। যারা রাস্তা দিয়া কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ হইয়া চলে, ইনি তো তাহাদের কেহ নন।

কিশোর দেখিল—তাহার সম্মুখে প্রথম উষার শুকতারা, তেমনই শুভ্র, তেমনই উজ্জ্বল। ওই যে বিশাল আয়ত লোচন, কি গভীর মর্ম্মভেদী তাহার দৃষ্টি। কিশোর সেই দৃষ্টির মধ্য দিয়া কোন অজ্ঞাত মানসলোকে চলিয়া গেল। কেশ অবেণীসংবদ্ধ,—পৃষ্ঠে কপোলে কর্ণমূলে তাহারা মৃদু পবনে চঞ্চল হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। অধরে কি দৃঢ় সঙ্কল্পের ভাব, যেন রাণীর মতো সর্ব্বদাই আদেশ করিতে প্রস্তুত। রক্তপদতল দুটী, স্থলপদ্মের চেয়েও বেশী সুন্দর, বিশ্বের সমস্ত শোভা আসিয়া যেন সেখানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

কিশোর স্থান কাল ভুলিয়া বিমূঢ়ের মতো অনিন্দিতার মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। দুইজনের দৃষ্টি বিনিময় হইতেই অনিন্দিতার কর্ণমূল ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি চক্ষু নত করিল।

কিশোরও কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া মুখ ফিরাইল। তাহার মনে হইল—"ছি ছি, আমি সামান্য কুলী, আমার এ কি প্রগল্‌ভতা!"

ক্ষণকালের মধ্যে ভাবরাজ্যে এই যে একটা ওলটপালট হইয়া গেল, তাহা কিন্তু নরেশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইল না। নরেশের মুখ মলিন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া অনিন্দিতাকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল—

"বেশ ভাল আছেন তো, আমাকে চিন্‌তে পাবেন নি বুঝি?"

অনিন্দিতা অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং কতকটা সেই ভাব চাপা দিবার জন্যই তাড়াতাড়ি বলিল,—"আসুন, নরেশবাবু, আপনিও বুঝি দাদার সঙ্গে গিয়েছিলেন। কি অদ্ভুত লোক আপনারা, একমাসের মধ্যে একটা খবরও কি দিতে নাই, আমরা তো ভেবে মরছি!"

নরেশ উত্তরে কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে মোহিত অনুযোগের স্বরে বলিল,—"ওসব আলোচনা ধীরে সুস্থে পরে হবে। এখন এই যে ক্লান্ত অবসন্ন কয়টী ভবঘুরে, এদের একটু জিরিয়ে নিতে দাও। অনি, কিশোরের দেখা শুনা করবার ভার, তোর উপরেই রইল। ও নূতন মানুষ, কিছু জানে না—"

কিশোর ঈষৎ লজ্জিতভাবে মৃদুস্বরে বলিল—"দাদা আমাকে যেমন অপটু মনে করেছেন, আমি মোটেই তা নই। বরং নরেশ দাকে—"

নরেশ এমন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে কিশোরের দিকে চাহিল যে, কিশোরের বাক্য অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

---

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"তারা কোথায় গেল দাদা ?"

ক্রোধে ক্ষোভে অনিন্দিতার স্বর রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল, তাহার মুখ উত্তেজনায় রক্তবর্ণ, দুই চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"তারা কোথায় গেল দাদা ?"

মোহিত বলিতে লাগিল—"হতভাগিনীকে যখন আমরা বোটে নিয়ে এলাম, তখনও সে মূর্চ্ছিত অচৈতন্য ; দমকা হাওয়ায় মাধবীলতা যেমন কেঁপে ওঠে, মাঝে মাঝে তার শরীর তেমনি কেঁপে উঠছিল, যেন তখনও স্বপ্নে সে কোন বিভীষিকা দেখছিল। বেচারা জনার্দ্দনের অবস্থাতো যার পর নাই শোচনীয়, সে যেন বিমূঢ় জড়ের মতো হয়ে গিয়েছিল। বোটের সম্মুখে খোলা জায়গায় লক্ষ্মীকে শুইয়ে দিয়ে, জনার্দ্দনকে বললাম, তুমি মেয়ের কাছে বসে থাক, গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাসে শীঘ্রই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।'

"আমরাও ক্লান্ত হয়েছিলাম, সুতরাং সবাই যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সে আশ্চর্য্য নয়। বোট গঙ্গাবক্ষে স্রোতের মুখে ছুটে চলেছিল। সকালবেলা যখন জাগলাম, তখনও আকাশে সূর্য্য ওঠে নি, কিন্তু অরুণের রক্তরাগ তার আগমন সূচনা ক'রছে। জেগেই দেখলাম, জনার্দ্দন, লক্ষ্মী কেউ নেই। মাঝিকে বললাম—তারা কোথায় গেলরে!"

মাঝি অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে বললে—"তাতো বলতে পারি নে বাবু—"

"সেকি রে! তোর চোখের সামনেই তো তারা ছিল, এরই মধ্যে কোথায় গেল—"

মাঝি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, বলি বলি করিয়াও কিছু বলিতে

পারিল না। আমি তাকে একটা ধমক দিয়ে বললাম—"সত্যি কথা বল—তারা কি জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ?"

মাঝি ভয়ে ভয়ে বলিল—"না—বাবু, মেয়েটীর শেষ রাত্রে জ্ঞান হয়েছিল। জ্ঞান হয়েও কেবলি সে কাঁদছিল। তার বাবা তাকে শান্ত করবার জন্য মিছে চেষ্টা করছিল। মেয়েটী কেবলই বলছিল—'বাবা আমার আর বেঁচে কি হবে ? এ মুখ আর কারো কাছে দেখাতে চাই নে—।" শেষে যখন ভোর হয়ে এল, লোকটী আমাকে বললে—"তুমি একবার ওই ঘাটের ধারে লাগাও তো, আমরা হাত মুখ ধুয়ে আবার এখনি ফিরে আসব।"

আমি প্রথমে রাজী হইনি, কিন্তু সে এত মিনতি করতে লাগল যে, শেষে বোট একটা ঘাটের ধারে ভিড়িয়ে দিলাম। তারা দুই জনেই নেমে গেল। আমি অনেকক্ষণ তাদের জন্য বসে রইলাম, কিন্তু তারা আর ফিরে এল না।"—

—"তোকে কি বলবো অনি, মাঝির কথা শুনে আমার বুকে যেন একটা তীর বিদ্ধ হল। মনে করেছিলাম,—আহা, বেচারা লক্ষ্মী, তোর আশ্রয়ে ওকে এনে রাখবো, ওদের একটা গতি করে দেবো। কিন্তু মানুষ যা চায়, তা হয় না। কোথায় গেল তারা, কোন অন্ধকারে মিশিয়ে গেল,—ওই নির্ব্বান্ধব দেশে কোথায় গিয়ে তারা আশ্রয় পাবে, কে এই নির্য্যাতিত অপমানিতদের প্রাণের বেদনা বুঝবে ?"

মোহিত একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইল। সেই করুণ দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে অনিন্দিতার ক্রোধ বিষাদে পরিণত হইল, তাহার দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল ;—বেদনাপ্লুত কণ্ঠে সে বলিল—"দাদা, এই তো আমাদের দেশের নারীজীবনের ইতিহাস। আজ তুমি লক্ষ্মীর কথা মনে করে দুঃখ করছো,—কিন্তু কত হাজার হাজার লক্ষ্মী যে

এ দেশে নিত্য অপমানিতা, নির্য্যাতিতা হচ্ছে, কে তাদের খোজ রাখে? বাঙ্গলার আকাশ বাতাস নির্য্যাতিতা নারীর অশ্রুজলে কলুষিত। অথচ পশুর অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে, এমন পুরুষ বাঙ্গলাদেশে নেই; বাঙ্গলা আজ পুরুষহীন, কতকগুলা ক্লীব কাপুরুষের দল পুরুষের ছদ্মবেশে এখানে বাস করছে।"

মোহিত নীরবে ভাবিতে লাগিল। তারপর অনিন্দিতার দিকে চাহিয়া বলিল—"ঠিক কথা বলেছিস অনি, এদেশে পুরুষ নেই, নইলে কি নারীর উপর এমন অত্যাচার হয়! কেবল তাই নয়, ওই সব নির্য্যাতিতা নারীরা যখন সমাজের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে, তখন তারা আশ্রয় পায় না; যে সব ক্লীব কাপুরুষ তাদের রক্ষা করতে পারেনি, তারাই আবার তখন সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সিংহ মূর্ত্তি ধারণ করে! এই যে বিরাট ভণ্ডামি—কপটতা,—এই শুয়ারের খোয়াড়ে আগুন ধরিয়ে দিতে না পারলে জাতির—সমাজের কল্যাণ নেই।"

সম্মুখের দেয়ালে তপস্বিনী নিবেদিতার একখানা ছবি টাঙ্গানো ছিল। অনিন্দিতা মোহিতের কথা শুনিতে শুনিতে একদৃষ্টে সেই ছবির দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল। সহসা মোহিতের দিকে ফিরিয়া সে বলিল—"দাদা, তুমি বল স্বাধীনতা না হলে এদেশের কোন উন্নতি হবে না। কিন্তু যে দেশে পুরুষেরা নারীর সম্মান রক্ষা করতে পারে না, সে দেশ কি কখনো স্বাধীন হতে পারে? মেয়েরা যেখানে পঙ্গু জড়, জাতির অর্দ্ধাঙ্গ যেখানে অবশ, সেখানে শক্তির বিকাশ হবে কেমন ক'রে। আমরা এ কথা বুঝতেও পারিনে;—কিন্তু ওই যে বিদেশিনী মহিলা, যিনি এই দুর্ভাগ্য দেশকেই স্বদেশ রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন, তিনি বুঝেছিলেন। তাই এদেশের নারীজীবনকে গড়ে তোলবার মহৎ আদর্শে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমার মনে হয় দাদা, এদেশের শিক্ষিতা মেয়েদের সামনে

আজ এই সবচেয়ে বড় কাজ, আমার ক্ষুদ্র জীবন আমি এই জন্যই উৎসর্গ করতে চাই।”

মোহিত কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ‘মোহিত দা—মোহিত দা,’ বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে নরেশ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। অনিন্দিতা তাড়াতাড়ি তাহার অসম্বৃত বেশভূষা সংযত করিয়া লইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং ঘর হইতে পলাইতে চেষ্টা করিল।

নরেশ হাসিয়া অনিন্দিতাকে নমস্কার করিয়া বলিল—“পালাচ্ছেন যে বড়? আমি কি একটা বাঘ, না, ভালুক, না, রেড ইণ্ডিয়ান ক্যানিবল, যে, আপনি এত শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন?”

অনিন্দিতা লজ্জিত কুণ্ঠিতভাবে বলিল—“শঙ্কার লক্ষণ কোথায় দেখলেন? অনেকক্ষণ দাদার কাছে বসে আপনাদের কাঞ্চনপুরের অ্যাড-ভেঞ্চারের কথা শুনছিলাম, এত যে বেলা হয়ে গেছে, বুঝতে পারি নি।”

নরেশ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—“হাঁ, আডভেঞ্চারই বটে, ওই কুলীযুবক কিশোরের সঙ্গে আর এক মিনিট পরে আমাদের দেখা হলেই সর্ব্বনাশ হ’ত।”

অনিন্দিতার মনে হইল, যেন “কুলীযুবক” এই শব্দটীর মধ্যে কি একটা প্রচ্ছন্ন শ্লেষ আছে; সে ঈষৎ বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইল, নরেশের কথার কোন উত্তর দিল না।

কিন্তু অনিন্দিতার এই ভাবান্তর নরেশ ঠিক বুঝিতে পারিল; তাই কতকটা তাহাকে খুসী করিবার জন্যই বলিল—“কালকে দেখলাম যে, মেয়েদের মস্ত বড় একটা সমিতি হয়েছে, আপনিই তার সেক্রেটারী হয়েছেন। এই তো চাই, আপনাদের মতো শিক্ষিতা মেয়েদের কাছে দেশ এই তো আশা করে।”

অনিন্দিতা খুব সংক্ষেপে উত্তর দিল—“হাঁ, একটা সমিতি করবার

চেষ্টা হচ্ছে বটে, আর একদিন তার কথা আপনাকে ব'লবো। যাই, আপনার জন্য চা নিয়ে আসি।"

বলিয়াই, নরেশের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অনিন্দিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নরেশ কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে অনিন্দিতার গতিপথের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর মোহিতের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"তুমি বোধ হয় ভুলে যাওনি মোহিত, যে, কালই সেই দিন—"

মোহিত যেন চমকাইয়া উঠিল। নরেশের দিকে চাহিয়া ঈষৎ বিষণ্ণভাবে বলিল—"না ঠিক ভুলে যাইনি, তবু তুমি মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করেছ। কিন্তু নরেশ, নিজের হাতে নিজের বুকে ছুরি বিদ্ধ করাও যে এর চেয়ে আমার পক্ষে সহজ কাজ ছিল!"

নরেশ একথার কোন উত্তর দিল না; শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সে হাসিতে করুণা বা সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না।

---

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আকাশে পাতালে আজ ঘোর সংগ্রাম বাধিয়াছে। প্রকৃতিদেবী যেন ছোটখাট একটা প্রলয়ের অভিনয় করিবার জন্যই কারাগারের দ্বার খুলিয়া উনপঞ্চাশ পবনকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, আর তাহারা রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জিয়া ফিরিতেছে। আকাশ জলদ জালে আছন্ন, চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত, ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলসিয়া সে অন্ধকারের ভীষণতা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। মাঝে মাঝে দূর হইতে সোঁ সোঁ শব্দ শুনা যাইতেছে, আর তাহার সঙ্গে বড় বড় বৃক্ষশাখা পতনের শব্দ, বজ্রের হুঙ্কার প্রভৃতি মিলিয়া, একটা বিষম অট্টরোলের সৃষ্টি করিতেছে। ক্ষুদ্র মানব আপনার বুদ্ধি ও শক্তির অহঙ্কার করে, কিন্তু প্রলয়ের এই ভূতগণের সম্মুখে তাহার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়, নিজের অজ্ঞাতসারেও এক সর্ব্ব বিধ্বংসী শক্তির রুদ্র তাণ্ডবের নিকটে আপনার মস্তক অবনত করিতে সে বাধ্য হয়।

বাহিরে যেমন প্রলয়ের ঝঞ্ঝা, প্রতিমার অন্তরও তেমনি আজ প্রলয় ঝটিকায় মথিত, সেখানেও ঘোর সংগ্রাম বাধিয়াছে। প্রতিমার জীবন—এই অষ্টাদশ বৎসর সুখে ও আনন্দেই কাটিয়াছে। আশার স্বপ্ন দেখিতেই সে অভ্যস্ত। পিতা মাতার একমাত্র আদরিণী কন্যা সে। তাহার ইচ্ছা কখনও অপূর্ণ থাকে নাই, তাহার ছোটখাট সকল অত্যাচার সকলে মিলিয়া সহ্য করিয়াছে, সকল দাবী মিটাইয়াছে। এ জীবনে প্রথম আজ সে আঘাত পাইল, দেখিল, তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় আশা, বড় আকাঙ্ক্ষা—সংসারের জটীল সমস্যার আবর্ত্তে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার উপক্রম। এই নিষ্ঠুর বিধান যদি তাহাকে মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়কে—অন্তরাত্মাকেই যে বলি দিতে হইবে।

* * * *

সুবোধ মজুমদার নামক একজন নবীন যুবক কয়েক মাস হইল প্রতিমাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছে। যুবকটী বিলাত হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিল। তাহার একটা প্রধান গুণ, বিলাত প্রত্যাগত হইলেও, বিলাতী আদব কায়দার নিকট সে দেশী সৌজন্য ও সহৃদয়তা জিনিষটা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া আসে নাই। সাদাসিদা ধুতি চাদর পরা এই প্রিয়দর্শন যুবকটীকে দেখিলে, কেহই 'বিলাত ফেরত' বলিয়া মনে করিতে পারিত না। তাহার মত মিষ্টভাষী সদালাপীও খুব কমই দেখা যায়। করুণাময় বাবু ও তাঁহার পত্নীর মন এই গুণেই সে অতি শীঘ্র ও সহজেই জয় করিয়া লইয়াছিল। প্রতিমাও তাহার উপর অপ্রসন্ন ছিল না। সুবোধ প্রথম হইতেই যে প্রতিমার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাকে খুসী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত, ইহা প্রতিমার দৃষ্টি এড়ায় নাই। সে কতদিন প্রতিমাদের বাড়ীতে সান্ধ্য বৈঠকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছে। বিলাত ও আমেরিকার নানারূপ অদ্ভুত ভ্রমণ-কাহিনী বলিয়া, দেশ বিদেশের লোকের বিচিত্র গল্প করিয়া সে প্রতিমাকে প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিত। ইহার উপর সে বেশ সুকণ্ঠ ছিল, দুই চারিটা বিদেশী সুরও অভ্যাস করিয়াছিল। এই সব দেশী ও বিদেশী গান গাহিয়া ও যন্ত্র বাজাইয়া অনেক সময় সে বেশ আসর জমাইয়া তুলিতে পারিত। প্রতিমা যদি কোন দিন তাহাকে কোন অনুরোধ করিত, তবে সকল কাজ ফেলিয়া সেইটী সে সর্ব্বাগ্রে পালন করিত।

প্রতিমাই তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া কুণ্ঠিত হইয়া সময় সময় বলিত,—'মিঃ মজুমদার, এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?" সুবোধ হাসিয়া বলিত—"আপনি জানেন না, মিস্ ঘোষ, দেবীর আদেশ পালন ক'রে, দীন ভক্তের কি আনন্দ।" সুবোধের এই অতিশয়োক্তিতে প্রতিমার কর্ণমূল লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত।

কিন্তু প্রতিমা কোন দিনই মনে করে নাই যে, এই সাধারণ বন্ধুত্ব ও ভদ্রতার দাবীর উপর নির্ভর করিয়া মিঃ মজুমদার উচ্চতর দাবী করিয়া বসিবেন। তাই যেদিন মিঃ মজুমদার প্রতিমাকে একান্তে পাইয়া নানারূপ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহার নিকট আর্জ্জি পেশ করিল যে, সে প্রতিমাকে জীবন সঙ্গিনীরূপে পাইবার সৌভাগ্য কামনা করে এবং তাহা না পাইলে তাহার সমস্ত জীবন মরুভূমির মতো শুষ্ক, নীরস ও ব্যর্থ হইয়া যাইবে, সে দিন প্রতিমা যে কেবল অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল তাহা নহে, ক্ষুব্ধ ও ব্যথিতও হইল। প্রতিমা মুখে কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে সে ঘর ছাড়িয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের ম্লান ছায়া দেখিয়া সুবোধ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, এ ব্রীড়াসঙ্কুচিত প্রণয়ের মূর্ত্তি নহে বা 'মৌনং সম্মতি লক্ষণও' নহে।

প্রতিমার সুপ্ত হৃদয় কিন্তু এই আকস্মিক আঘাতে জাগ্রত হইয়া উঠিল। বৈজ্ঞানিকের মায়াদণ্ড স্পর্শে লজ্জাবতী লতার দেহে যেমন প্রাণের সাড়া পড়িয়া যায়, প্রতিমার হৃদয়েও তেমনি যে প্রেম এতদিন অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত ছিল, সে আজ ভুবনমোহন বেশে নিজের সিংহাসনে চাপিয়া বসিল। প্রতিমা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সে সিংহাসনের অধিকারী মোহিতলাল! মোহিতকে বাল্যাবধি সে সখী অনিন্দিতার দাদা এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয়রূপেই দেখিয়াছে। কিন্তু আজ দেখিল যে, ধীরে ধীরে দিনের পর দিন সেই লোকটীই তাহার হৃদয় কেমন করিয়া সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সেখানে অন্য কাহারও তিলমাত্র স্থান নাই। যতই সে চেষ্টা করুক না কেন, মোহিতের কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না, বরং যত চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই মোহিতের সদা হাস্যময় মুখখানি অন্তরের অন্তরতম স্থানে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।

মানুষ এই বৈজ্ঞানিক যুগে যতই সাবধানী, যুক্তিবাদী, উন্নত ও সভ্য হোক না কেন, প্রেম নামক দুর্ব্বলতা বা ব্যাধির হাত হইতে

এখনও সে মুক্ত হইতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও কোন দিন পারিবে বলিয়া মনে হয় না। সকল যুক্তি ও বিচারকে পরাস্ত করিয়া, প্রেম অতি বুদ্ধিমান ও সভ্য যুবকযুবতীদেরও অকস্মাৎ বিব্রত করিয়া ফেলে, সহজ বুদ্ধিতে যাহা হাস্যকর বলিয়া মনে হয়, প্রেমরোগগ্রস্ত যুবকযুবতীরা সকলের বিদ্রূপ ও উপহাস তুচ্ছ করিয়াও, তাহাই একান্ত সঙ্গত ও শোভন মনে করে। হইতে পারে, মোহিত নিষ্কর্ম্মা ও ভবঘুরে, জীবনে আর দশজনের মতো সে কৃতিত্ব লাভ করে নাই, লেখাপড়াতে সে দিগ্‌গজ পণ্ডিত নয় বা কোনই দিনই হয়ত একটা অতিকায় ধনী বা সমাজে প্রতিষ্ঠাবান্, পদমান বিশিষ্ট জাঁদরেল লোক বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু প্রতিমার নিকট এ সকল অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল; সে যে মোহিতকে ভালবাসে এবং মোহিতও তাহাকে ভালবাসে, (এ সম্বন্ধে প্রতিমার কোন সন্দেহ ছিল না,)—এই তো যথেষ্ট! এর বেশী সে কিছু চায় না, চাহিবার প্রয়োজনও তাহার নাই।

(২)

কিন্তু প্রতিমা জানিত না যে, এ সকলে তাহার নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও, তাহার পিতামাতার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। করুণাবাবু ও তাঁহার পত্নী দেখিলেন যে, সুবোধ ছেলেটী বেশ, বিদ্যাও আছে, অর্থোপার্জ্জনের শক্তিও আছে;—আর তাহার বিনয় ও মিষ্ট ব্যবহারে সে সকলের হৃদয় জয় করিয়া লইতে পারে। সুতরাং সুবোধ যখন প্রতিমার নিকটে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও করুণাবাবু ও তাঁহার পত্নীকে প্রকারান্তরে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিল, তখন তাঁহারা পরম আনন্দিতই হইলেন, যেন ইহারই জন্য তাঁহারা এতদিন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। সুবোধ বেশ বুঝিতে পারিল যে, এ বিবাহে প্রতিমার পিতামাতার খুবই আগ্রহ আছে। সে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতিমাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু মা মেয়ের কাছে কথাটা পাড়িয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, সেদিক হইতে কোন সাড়া আসিতেছে না। প্রথমে তিনি ভাবিলেন, ওটা মেয়ের স্বাভাবিক লজ্জা ও সঙ্কোচের ফল; শীঘ্রই কিন্তু তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল। মেয়ে একটু দৃঢ়তার সঙ্গেই মাকে জানাইয়া দিল যে, সুবোধ বাবু সব বিষয়েই খুব ভাল লোক হইতে পারেন, কিন্তু তাহার নিজের চিরকুমারী থাকিবারই ইচ্ছা। করুণাবাবু সকল কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি কখনই কল্পনা করেন নাই যে, মোহিতের দিকে তাঁহার মেয়ের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ও তাঁহার পত্নী মোহিতকে ছেলের মতই ভালবাসিতেন। কিন্তু তাহাকে জামাতারূপে পাইবার চিন্তা তাঁহাদের মনে কখনও উদয় হয় নাই।

সুতরাং প্রতিমার মনের গোপন ব্যথা কোথায়, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। করুণা বাবু মেয়েকে নিজের কাছে ডাকিয়া গম্ভীরভাবে অনেক সদুপদেশ দিলেন এবং তিনি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই যে মেয়েকে যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিয়া যাইতে চান, একথাও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। মা মেয়েকে কোলের কাছে বসাইয়া, গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া, চোখের জল ও অভিমানের সঙ্গে তাহার হৃদয় বিগলিত করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রতিমা পিতার উপদেশ, মাতর আদর ও অশ্রুজলের উত্তরে কিছুই বলিল না, মৌন সহিষ্ণুতার সঙ্গে স্নেহের এই অত্যাচারকে সহ্য করিল। মোহিতের প্রতি তাহার অসীম অনুরাগের কথা সে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিল না।

অবশেষে প্রতিমার মা অনিন্দিতাকে একদিন ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনিন্দিতা সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া খুব খুসী হইল না, কিন্তু মুখে বলিল—"এতো বেশ ভাল কথা জ্যাঠাই মা, মিঃ মজুমদারের মতো অমন সুপাত্র কোথায় পাওয়া যায়। প্রতিমার এতে অমত হবার তো কোন কারণ দেখ্‌ছি নে।"

প্রতিমাকে যাইয়া বলিল—"আমিই না হয় সাফ্রেজিট হয়েছি, কিন্তু

তোর তো সনাতন নারীধর্ম্ম পালন করবার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। হঠাৎ এ নূতন ভাব কেন?"

প্রতিমা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"বুঝতে পারিস্ নি, ওটা সঙ্গের গুণ। আমিও তোর দলে নাম লেখাব।"

বলাবাহুল্য, অনিন্দিতা প্রতিমার এই সহজ প্রতারণায় ভুলিল না। প্রতিমার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া সে দেখিল, এই কয়দিনেই তাহার মুখ শুষ্ক ও ম্লান হইয়া গিয়াছে, চোখের কোণে ঈষৎ কালি পড়িয়াছে, কি একটা গভীর চিন্তা ও উদ্বেগ যে তাহার অন্তরকে পীড়িত করিতেছে, তাহার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

স্নিগ্ধস্বরে অনিন্দিতা বলিল—"প্রতিমা, মিঃ মজুমদার তো অযোগ্য লোক নন, মেয়েরা যা চায়, সে সবই তাঁর আছে। আর আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তিনি তোকে আন্তরিক ভালবাসেন। তবে তোর এতে অমত কেন?

প্রতিমা বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"তোর যদি মিঃ মজুমদারকে এতই পছন্দ হয়ে থাকে, তবে তুই-ই তাঁর গলায় বরমাল্য দে না কেন? তিনি ধন্য হয়ে যাবেন। আমাকে না পাওয়ার দুঃখ অতি সহজেই ভুলতে পারবেন।"

"ঠাট্টা নয় প্রতিমা, আমাকে বলতেই হবে, তোর মনের আসল ভাবখানা কি। কেন, তুই কি মিঃ মজুমদারকে পছন্দ করিস নে? না, আর কোন ভাগ্যবানের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিস্?"—বলিয়াই অনিন্দিতা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

কিন্তু প্রতিমা সে হাসিতে যোগ দিল না, তাহার মুখ কেমন বিবর্ণ হইয়া গেল, চোখের পাতা অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। সে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

অনিন্দিতা ভাবিতে লাগিল—প্রতিমা সত্যই কি দাদাকে এত ভালবাসে?

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রতিমা গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আপনার কক্ষে বসিয়া এই সব কথাই ভাবিতেছিল। একদিকে পিতামাতার আগ্রহ, তাঁহাদের স্নেহের দাবী, সখীর অনুরোধ,—অন্যদিকে তাহার নিজের হৃদয়ের দাবী, জীবনের অন্তরতম আশা ও আকাঙ্ক্ষা ;—এই বিষম দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া প্রতিমার তরুণ হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল। পিতামাতা তো তাহার মঙ্গলের জন্যই ব্যগ্র ; জীবনে যাহাতে সে সুখী হয়, সেই তাঁহাদের একমাত্র ইচ্ছা, তাহা সে জানিত ; আর হিন্দুর ঘরের মেয়ের পক্ষে বাপমায়ের আদেশ পালন করাই যে সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য, এও সে শিখিয়াছিল। কিন্তু সে কি করিয়া তাহার হৃদয়ের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবে, নিজের কাছে মিথ্যাচারী হইবে,—যাহাকে সে কখনই স্বামীরূপে ভাবিতে পারে না, তাহাকেই হাসি মুখে বরণ করিয়া লইবে ;—আর যাহাকে সে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া বসিয়াছে, তাহার প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে! একথা কল্পনা করিতেও তাহার সমস্ত অন্তর গ্লানিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, যেন একটা বিষধর সর্প তাহার হৃদয়কে জড়াইয়া জড়াইয়া পীড়ন করিতে লাগিল। না, এ সে কখনই করিতে পারিবেনা,—প্রাণ গেলেও নয়! বাবা ও মা তাহার অপ্রত্যাশিত আচরণে মনে গুরুতর আঘাত পাইবেন, সন্দেহ নাই। তার পর, তাঁহারা যদি তাহার হৃদয়ের মনের গোপন কথা জানিতে পারেন, তবে হয়ত অবাক্ হইয়া যাইবেন। কিন্তু তাহার আর উপায় কি আছে! অন্য দশজন মেয়ের মত তুচ্ছ সাংসারিক সুখ ঐশ্বর্য্যের জন্য নারী ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া সে সুশীলা বালিকা সাজিতে পারিবে না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল ;—বাহিরে ঝটিকা তখনও

অট্টহাস্য করিতেছিল, মাঝে মাঝে প্রলয়ের হুঙ্কারে চারিদিক কাঁপাইয়া বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। প্রতিমা কিন্তু সে দিকে খেয়াল ছিল না। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ ছিল, কিন্তু তাহাদেরই কোন ফাঁকে ফাঁকে দমকা হাওয়ার বেগ বৃষ্টির ছাটের সঙ্গে আসিয়া কক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিতেছিল।

সকলেই আজ যেন তাহার জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে। সখী অনিন্দিতা হয়তো তাহার হৃদয়ের কথা অনুমান কবিতে পারিয়াছে, কিন্তু সেও তাহার প্রতি এমন নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল কেন। সে ইচ্ছা করিলে মা ও বাবাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিত। কিন্তু খুব সম্ভব তাহা সে করিবে না। তাহারও বুঝি ইচ্ছা, মিঃ মজুমদার-কেই সে—। কেন মিঃ মজুমদার লোকটা কি যাদুকর? সকলের মন, বিশেষতঃ অনিন্দিতার মন সে জয় করিল কিরূপে? যাইবার সময় অনিন্দিতার শেষ কথা গুলি প্রতিমার মনে পড়িয়া গেল,—"যে জিনিষ পাবার নয়, তার দিকে মন দিলে, শেষ পর্য্যন্ত কেবল নৈরাশ্যের গ্লানিই ভোগ করতে হয়।"

কেন, মোহিত দা কি তাহাকে পায়ে স্থান দিবেন না। তিনি কি তাহাকে ভালবাসেন না? নাই বা ভাল বাসিলেন, সেতো তাঁহাকে ভালবাসে! আর যদি শেষ পর্য্যন্ত নৈরাশ্যের গ্লানিই ভোগ করিতে হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি! সে চিরজীবন কুমারীই থাকিবে, হৃদয় দেবতাকে চিরদিন অন্তরে বসাইয়াই পূজা করিবে। বাবা ও মার পায়ে ধরিয়া সে এই ভিক্ষাই গ্রহণ করিবে,—বলিবে, তাঁহাদের এই অবাধ্য মেয়েকে ক্ষমা করিতে হইবে।

বাহিরে ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি আসিয়া নামিল, ঝড় ও বৃষ্টিতে মাতামাতি করিতে লাগিল। বৃষ্টির দুই একটা ছাঁট জানালা গলিয়া ঘরের ভিতরেও আসিতে লাগিল।

হঠাৎ প্রতিমা শুনিল, পাশের ঘরে কি একটা জিনিষের পতনের শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য পদশব্দও শোনা গেল, মনে হইল। পাশের ঘর প্রতিমার বাবার বসিবার ঘর ও লাইব্রেরী, এই খানে তাঁহার নিজের অনেক সখের আসবাব পত্র এবং মূল্যবান জিনিষও থাকিত। তিনি অনেক সময় রাত্রে ঐ ঘরেই থাকিতেন, কিন্তু আজ ছিলেন না। প্রতিমার কক্ষ ও ঐ কক্ষের মধ্যে একটী দরজা, তাহা প্রতিমার কক্ষের ভিতরের দিক হইতে শিকল বন্ধ ছিল। দরজার অপর দিক ঘরের ভিতর হইতে বন্ধ ছিল কি না, প্রতিমা জানিত না। প্রতিমা দরজাব নিকটে কাণ পাতিয়া কিছুক্ষণ শুনিল। মানুষের সাড়া সে স্পষ্ট অনুভব করিল। সে ধীরে-ধীরে নিঃশব্দে দরজার শিকল খুলিল, তার পর আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া দেখিল, দরজা অপর দিক হইতে বন্ধ নাই। প্রতিমা দরজা ঠেলিয়া অতি সন্তর্পণে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না ; কেবল মনে হইল রাস্তার ধারের জানলার পার্শ্বে একটা মানুষের ছায়ার মত দেখা যাইতেছে।

প্রতিমা বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ টিপিয়া দিল। অকস্মাৎ তীব্র আলোকে সমস্ত কক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, আর সেই আলোকে যে দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল, তাহাতে প্রতিমা বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে দেখিল—ঘরের মধ্যে জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া মোহিত! এই গভীর নিশীথে ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যে, মোহিত দা তাহাদের বাড়ীতে আসিলেন কেন, আর কেমন করিয়াই বা আসিলেন? অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়াই বা তিনি কি করিতেছেন? মুহূর্ত্তের মধ্যে এই সব চিন্তা প্রতিমার মনে বিদ্যুতের মতো খেলিয়া গেল। সে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার তো কোন ভুল হয় নাই! আবার সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল ;—না, ভুল তো হয় নাই! মোহিতের দিকে

অগ্রসর হইয়া সে তাহাকে প্রশ্ন করিতে যাইবে,—এমন সময় মোহিত চক্ষের নিমিষে জানালা গলিয়—লাফাইয়া পড়িল এবং ঝড়বৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রতিমা ছুটিয়া জানালার নিকটে গেল। বাহিরে সীমাহীন অন্ধকার, তাহার মধ্যে ঝড় ও বৃষ্টির দ্বন্দ্ব চলিতেছে, বৃক্ষশাখাগুলি যেন যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইতেছে। একবার বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল, প্রতিমা বিদ্যুতালোকে ক্ষণেকের জন্য দেখিল, মোহিত সেই ঝড়বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া দূরে মাঠের মধ্য দিয়া ছুটিতেছে।

প্রতিমা আর্ত্তনাদ করিয়া কক্ষতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যখন প্রতিমার জ্ঞান হইল, তখন উষার আলো ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিমা দেখিল, বাড়ীর সমস্ত লোকজন আসিয়া তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে ; তাহার মা তাহার মাথা কোলে লইয়া বসিয়াছেন এবং মুখে চোখে জলের ছিটা দিতেছেন ; পিতা উদ্বেগ ব্যাকুলনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণোন্মত আকাশের ন্যায়। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার শেষ স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ দমকা বাতাস তখনও মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিতেছে।

প্রতিমা শুনিল, তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহার বাবাই প্রথমে সে ঘরে দৌড়াইয়া আসেন। কিন্তু তিনি প্রথমে মেয়েকে লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়েন। পরে বাড়ীর অন্য লোকজন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে দেখা গেল যে, রাস্তার ধারের দুইটী লোহার গরাদ ভাঙ্গা। অনুসন্ধানে আরও প্রকাশ পাইল যে, করুণাবাবুর রিভলভার দুইটী সেই ঘর হইতে চুরি গিয়াছে, কিন্তু ঘরের অন্য মূল্যবান জিনিষ বা কাগজপত্র সবই ঠিক আছে।

করুণাবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। চোর যে জানালার গরাদ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছিল এবং সেই দিক দিয়াই পলায়ন করিয়াছে তাহাতো সুস্পষ্ট। কিন্তু এ কেমন চোর? ঘরের অন্য কোন জিনিষ স্পর্শ করিল না, শুধু রিভলভার দুইটী লইয়া পলায়ন করিল। করুণা-বাবু শুনিয়া ছিলেন, 'এনার্কিষ্টেরা' এইভাবে বন্দুক রিভলভার চুরি করে, খুন ও ডাকাতি করিবার জন্য। এ চোর কি তবে এনার্কিষ্ট? কিন্তু

কেমন করিয়া সে তাঁহার রিভলভারের সন্ধান পাইল? করুণাবাবু গবর্ণমেণ্টের পেন্সনভোগী কর্ম্মচারী; তিনি বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে নানা সন্দেহ ও আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল।

এতক্ষণে তাঁহার মনে হইল, প্রতিমা হয়ত এ সম্বন্ধে কোন সন্ধান দিতে পারে। প্রতিমা তখন একটু সুস্থ হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মা, তুমি কি এ ঘরে কোন লোক দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলে?"

এই প্রশ্নে প্রতিমার মুখ মড়ার মত সাদা হইয়া গেল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না। মোহিত-দা কি তবে 'চোর'? তিনিই কি জানালা ভাঙ্গিয়া অন্ধকার রাত্রে ঘরে আসিয়াছিলেন, তিনিই কি বাবার রিভলভার চুরি করিয়াছেন? না—না, অসম্ভব, এ কাজ তাঁহার দ্বারা হইতে পারে না! যাহাকে সে ঘরের মধ্যে দেখিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই মোহিত-দা নয়। প্রতিমার নিজেরই দৃষ্টি বিভ্রম হইয়াছে। মোহিত-দার কথাই সে ভাবিতেছিল, তাই চোরকেও মোহিত-দা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে। মোহিত-দা রিভলভার চুরি করিতে আসিবেন কেন, রিভলভারে তাঁহার কি দরকার? কোন দরকারই থাকিতে পারে না, আর দবকার থাকিলেই বা অন্ধকারে গোপনে সিঁদ কাটিয়া চুরি করিতে আসিবেন কেন? নিশ্চয়ই সে কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে।

কিন্তু দৃষ্টিবিভ্রম, দুঃস্বপ্ন প্রভৃতির কথা কল্পনা করিয়া প্রতিমা যতই নিজের মনকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল, ততই তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মন জোর করিয়া বলিল, দৃষ্টিবিভ্রম বা দুঃস্বপ্ন কখনই নয়, হইতে পারে না; সে যে জাগ্রত অবস্থায় উজ্জ্বল আলোকে স্পষ্টই দেখিয়াছে, মোহিতদা ঐ জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া; আবার

জানালা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগের মধ্যে তাহাকে পলাইতেও দেখিয়াছে। কোন ভ্রমই তো হয় নাই। তবে কি মোহিত-দা সত্যই চোর? প্রতিমার হৃৎপিণ্ডে কে যেন হাতুড়ি দিয়া সজোরে আঘাত করিতে লাগিল।

তবে কি সে মোহিত-দার নাম সকলের নিকট বলিয়া দিবে? স্বচক্ষে ঘরের ভিতর যাহা দেখিয়াছে, তাহা বাবাকে জানাইবে? তাহার পরিণাম, মোহিত-দাই রিভলভার চোর সাব্যস্ত হইবেন, পুলিশ আজই তাঁহাকে ধরিবে, আদালতে তাঁহার বিচার হইবে, প্রতিমাকেই যাইয়া আদালতে সকলের সম্মুখে মোহিত-দার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হইবে। মোহিত-দা কারাগারে বা নির্ব্বাসনে যাইবেন, তাঁহার নাম চিরকলঙ্কিত হইয়া থাকিবে, জীবনে আর তিনি মাথা তুলিতে পারিবেন না। উঃ সে কি ভয়ঙ্কর! না—না, কখনই সে মোহিত-দার কথা প্রকাশ করিতে পারিবে না—প্রাণ গেলেও নয়!

সহসা তাহার মনে হইল, ইহার মধ্যে হয়ত কোন গূঢ় রহস্য আছে। মোহিত-দা নিশ্চয়ই কোন ভাল উদ্দেশ্যেই রিভলভারটী লুকাইয়া লইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজেই হয়ত বাবার কাছে আসিয়া সে কথা বলিবেন। প্রতিমার মন অকুলসাগরে নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় এই শেষ আশ্রয়টীকে অবলম্বন করিয়া সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, সেই ক্ষীণ সান্ত্বনার বাঁধ ভাঙ্গিয়া চিন্তার তরঙ্গ একটীর পর একটী আসিয়া তাহাকে অবশ করিয়া ফেলিল।

করুণাবাবু মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি বিশেষ উদ্বিগ্নচিত্তে দেখিলেন যে, সহসা সম্মুখে 'ভূত' দেখিলে লোকে যেমন আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠে, প্রতিমার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। রাত্রে নিশ্চয়ই সে কোন ভীষণদৃশ্য দেখিয়াছিল,

তাহার ভয়ঙ্কর স্মৃতি এখনও সে ভুলিতে পারিতেছে না। করুণাবাবু উদ্বেগ ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন—

"থাক মা, ও কথায় এখন আর দরকার নেই, পরে এক সময়ে শুন্‌লেই হবে।" গৃহিণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"প্রতিমাকে ওর বিছানায় শুইয়ে দাও, যাতে একটু ঘুমুতে পারে, সেই চেষ্টা কর। হা ভগবান, একি দুর্দ্দৈব!"

---

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। বহুবাজারের একটা জনশূন্য গলিতে মিউনিসিপালিটির কৃপায় অন্ধকার তখনও অটলভাবে বিরাজ করিতেছে। নরেশ একা সেই অন্ধকার গলির পথে চলিয়াছে। বাহিরের অন্ধকার অপেক্ষা তাহার হৃদয়ের অন্ধকারও কোন অংশেই কম নহে। নরেশ অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু একখানি অনিন্দ্যসুন্দর মুখ, দুইটী প্রতিভাময় উজ্জ্বল চক্ষু কিছুতেই সে ভুলিতে পারিতেছে না। হৃদয়ের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া অবশেষে সে রণশ্রান্ত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিবার উপক্রম করিয়াছে। ক্ষতি কি? সে তো কোন অন্যায় কার্য্য করিতেছে না? তাহার হৃদয়ের নিগূঢ়ভাব অতি গোপনে অন্তরের অন্তঃস্থলে সে লুকাইয়া রাখিবে, জগতের কেহই তাহা জানিতে পারিবে না,—এমন কি অনিন্দিতাও নহে। কোন দিন নরেশ অনিন্দিতার নিকটেও তাহার হৃদয়ের অসীম ভালবাসা ব্যক্ত করিবে না,—দূর হইতে তাহাকে দেখিবে, তাহার কথা ভাবিয়াই সে তৃপ্ত হইবে। এই কঠোর দুঃখময় জীবনে ইহাই তাহার একমাত্র সান্ত্বনা,—বিশাল মরুভূমির মধ্যে স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনীর ক্ষীণ রেখাটীর মতো।

ইহাতে কি দেশের প্রতি—তাহার জীবনের ব্রতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে? বাহিরের লোকে, এমন কি মোহিতও তাহাই মনে করিতে পারে বটে। কিন্তু নরেশ তো ব্রতভঙ্গ করিতেছে না, কর্ম্মের প্রতি অবহেলা করিতেছে না,—দেশের প্রতি তাহার ভালবাসা, মুক্তি সংগ্রামের প্রতি নিষ্ঠা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই,—হইবার সম্ভাবনাই বা কি? একজনের সুন্দর,

মুখখানি অতি গোপনে মনে মনে ভাবিলে,—দুই একবার তাহাকে দেখিলে কোন দিকেই কোন ক্ষতি বা কর্ত্তব্যচ্যুতি হইতে পারে না। বরং সে পূর্ব্বের চেয়ে দেশের সেবায়,—ব্রত উদযাপনে কঠোরতর সাধনা করিবে, দেহমনকে একটুকুও বিশ্রাম দিবে না। যদি 'কঠোর নীতির' দিক দিয়া ঈষৎ একটু ব্যতিক্রমই হয়, তবে কঠোবতর কর্ম্মের দ্বারা কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না? 'কায়েন মনসা বাচা'—ব্রহ্মচর্য্যের যে নিয়ম আচার্য্য বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহা দুর্ব্বলকে সাবধান করিবার জন্য;—কিন্তু নরেশ তো আর 'দুর্ব্বলচিত্ত' নহে, তাহার পক্ষে অত অনাবশ্যক কড়াকড়ি না করিলেও চলে।

নরেশ যে অনিন্দিতাকে দূর হইতে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, তাহা কোন ক্রমেই তাহাকে জানিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু তাহার যাহাতে অমঙ্গল বা অকল্যাণ হয়, তাহা নরেশ হইতে দিবে না, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার অজ্ঞাতসারেই, তাহাকে সকল অমঙ্গলেব হাত হইতে রক্ষা করিবে। মোহিত বড় সরল প্রকৃতির লোক, অনেক বিষয়ে মোটেই তাহার খেয়াল নাই। তার পব, ওই বালক কিশোরের প্রতি মোহিতের কেমন একটা অন্ধ ভালবাসা জন্মিয়াছে। কিন্তু কিশোরের সঙ্গে অনিন্দিতার অতটা ঘনিষ্ঠতা কি ভাল? অনিন্দিতার সঙ্গে কিশোর যেমন অসঙ্কোচে মিশে, গল্প করে,—ওটা ঠিক শোভন হইতেছে না। হইলই বা অনিন্দিতা শিক্ষিতা মেয়ে! তবু একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? কিশোর বলে, সে ব্রাহ্মণের ছেলে, হইতে পারে। কিন্তু সে তো ভদ্র সমাজে, বিশেষতঃ শিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে কোনদিন মিশে নাই, মিশিতে জানেও না,—চিরকাল কুলীগিরি করিয়াই কাটাইয়াছে। খাঁ কুলী—মোটবহা কারখানার কুলী। একজন কুলী যে অনিন্দিতার সঙ্গে অমন নিঃসঙ্কোচে মিশিবে—নরেশ কিছুতেই তাহা বরদাস্ত করতে পারিবে না। আজকাল সোসিয়ালিজম ক্যমুনিজমের

একটা ধূয়া উঠিয়াছে। হয়ত পাশ্চাত্যদেশে রাশিয়ায় ওটা চলতে পারে,—কিন্তু এই প্রাচ্য ভারতে সেটার আমদানী করা মূর্খতা। এই অশোভন ব্যাপারের হাত হইতে অনিন্দিতাকে রক্ষা করিতেই হইবে!

কিন্তু এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার নরেশের কি অধিকার আছে? কেন নাই?—সে কি একেবারেই পর?—নরেশের বন্ধু তো সে—অনিন্দিতারও কল্যাণকামী,—অন্ততঃ মুটে মজুর কুলী তো নয়—শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে! অনিন্দিতাকে একদিন আভাসে বলিতে হইবে, যদি সে না বুঝিতে পারে, তবে মোহিতকেই বলিতে হইবে। নরেশের ইহাতে কোন স্বার্থ নাই,—কেবলমাত্র অনিন্দিতার মঙ্গলের জন্যই—

সহসা নরেশের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, মনে হইল, কে যেন তাহার অনুসরণ করিতেছে। পশ্চাৎ ফিরিতেই সে দেখিল, যেন একটা অস্পষ্ট ছায়া পার্শ্ববর্ত্তী গলির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। নরেশ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। চারিদিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ, গলির দুই পার্শ্বে যে সব বাড়ী, তাহার অধিবাসীরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কোথাও মানুষের চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না। তবে কি তাহারই ভ্রম হইল? নরেশ আবার পথ চলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চলিয়া নরেশ আর একটা গলির মুখে আসিল। এই গলিটা আরও বেশী সঙ্কীর্ণ, অন্ধকারময়। নরেশ এদিক ওদিক চাহিয়া ধাঁ করিয়া সেই গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। একটা পুরাতন দোতালা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া আস্তে আস্তে দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ কেহই কোন সাড়া দিল না, বাড়ীতে যে কোন জনপ্রাণী আছে, লক্ষণেও তাহা বোধ হইল না।

অবশেষে ধীরে ধীরে দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত হইল,—ভিতর হইতে শব্দ আসিল "কে?"

"রোহিণী বাবুর বাড়ী ?"

দরজা আর একটু উন্মুক্ত হইল,—নরেশ ভিতরে প্রবেশ করিল।

( ২ )

অস্পষ্ট অন্ধকারময় কক্ষ। একটা ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কক্ষের অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর করিতে পারে নাই। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক চসমা পরা চোখে সেই ক্ষীণ প্রদীপের নিকট ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি একটা কাগজের লেখা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতেছিলেন। ললাটে চিন্তার রেখা, ঈষৎ কুঞ্চিত ভ্রূযুগ উদ্বেগ ও সংশয়ের পরিচয় দিতেছিল। মাঝে মাঝে তিনি কাণ পাতিয়া বাহিরের পদশব্দ শুনিতেছিলেন। নরেশ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে, প্রৌঢ় ভদ্রলোক কাগজখানা ভাঁজ করিয়া পকেটে ফেলিয়া বলিলেন—-

"এস এস নরেশ বাবু, তোমার কথাই আমি ভাবছিলাম। আমি জানি যে, তুমি আমার কথা রাখবে।"

নরেশ ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে প্রৌঢ়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি আমার পিতৃবন্ধু—আবাল্য পরিচিত, আপনার কথা না রেখে আমার উপায় নেই। কিন্তু আমি এখনও বুঝ্‌তে পারিনি, রোহিণীবাবু, আমার সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন ?"

রোহিণীবাবু অত্যন্ত উদারভাবে হাসিয়া বলিলেন—"তোমাদের মত মহাপ্রাণ যুবকদের সঙ্গে দেখা হওয়াই সৌভাগ্যের কথা। তুমি যে দুর্গম পথের পথিক, আমিও অনেক দিন থেকে সেই পথেরই সন্ধান করছি।"

কোন গুপ্তশত্রু অতর্কিত ভাবে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে জানিতে পারিলে, লোকে যেমন আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হয়, নরেশ রোহিণীবাবুর কথায় তেমনই সচকিত হইয়া উঠিল।

নরেশ নীরস কণ্ঠে বলিল—"আপনার হেঁয়ালী আমি বুঝ্‌তে পারছিনে।

আমি মহাপ্রাণও নই, কোন দুর্গম পথেরও ধার ধারিনে। তবে আপাততঃ অন্নসমস্যায় বিব্রত আছি বটে, একটা ছেলে পড়িয়ে কিছু পাই, তাতে চলে না। আপনার শুনেছি, অনেক সাহেব সুবো, বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ আছে। কিছু একটা কাজকর্ম্ম খুঁজে দিন না ?"

রোহিণীবাবু এবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"নরেশ, তুমি কি আমাকে এতই নির্ব্বোধ ভেবেছ ? তুমি সোনার টুকরো ছেলে, তোমার যদি গোলামি করবার ইচ্ছা থাকতো, তবে ভাল ভাল সোনার শিকলই জুটতো ! কিন্তু সে সব তুমি স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করেছো, তা কি আর আমি জানিনে ? আহা, তোমার বাবার কথা আমার এখনো মনে আছে। শেষ বয়সে কি অর্থ কষ্টই না তিনি পেয়েছিলেন ? তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল, তোমার উপার্জ্জনের টাকা—। থাক, সে সব সামান্য কথা তুলে লাভ নেই। তুমি তার চেয়ে অনেক বড় কাজের ভার নিয়েছ। আজ ২৫ বৎসর আমিও এই সাধনা করছি—যদি তোমার মত যুবকদের সহায়তা পাই—তবে কিনা করতে পারি !"

রোহিণীবাবু মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, সে হাসিতে কি একটা মাদকতার শক্তি—চুম্বকের আকর্ষণ ছিল। নরেশ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রোহিণীবাবুর আপাদমস্তক দেখিয়া লইল, তার পরে ধীরভাবে বলিল—

"আপনি আগাগোড়াই ভুল বুঝেছেন, রোহিণীবাবু। এ সব বড় বড় কথা ভাববার সময় আমার নেই। আমি একজন বেকার, ইংরাজীতে যাকে বলে unemployed। বেকারের আবার 'বড় কাজ' কি ?"

রোহিণীবাবু হাসিয়া বলিলেন—"বেকারই তো সত্যিকার দেশ সেবক হতে পারে ! সকল দেশেই স্বাধীনতা সংগ্রাম এই বেকারের দলই চালিয়েছে। এ দেশেও তাই হবে। কিন্তু ঠিক সময় এখনো আসেনি।"

নরেশ যেন কতকটা কৌতূহলপরবশ হইয়াই বলিল—"সে কি

রোহিণীবাবু, স্বাধীনতা লাভের আবার সময় অসময় আছে না কি? দিনক্ষণ দেখে, তিথিনক্ষত্র খুঁজে, স্বাধীনতা লাভের জন্য আসরে অবতীর্ণ হতে হবে? জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি আপনার দেখ্‌ছি, অগাধ বিশ্বাস! কিন্তু ইতিহাসে তার নজির নেই!"

রোহিণীবাবু ধীরে ধীরে তাঁহার বিরলকেশ মস্তকটী সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—"আছে বৈকি—পলিটিক্যাল পাঁজীও আছে হে? এই দেখনা, কতকগুলি অসহিষ্ণু প্রকৃতির ছেলের দল মিলে যে বোমা তৈরী করছে, পিস্তল চালাচ্ছে, খুন ডাকাতি করছে,—এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে?" তারপর হঠাৎ স্বর নামাইয়া খুব চাপা গলায় বলিলেন—"আচ্ছা নরেশ, তুমি এদের সম্বন্ধে কিছু জানো কি? আমার তো, বাবা, মনে হয় যে—"

নরেশ মনে মনে হাসিয়া বলিল—"আমি আগেই তা অনুমান করেছিলাম।" বাহিরে গম্ভীর ভাবে বলিল—"আজ্ঞে, কিছুই জানি না; তবে খবরের কাগজে দেখ্‌তে পাই বটে যে, কতকগুলো লোক বোমা পিস্তল দিয়ে দেশ স্বাধীন করবার চেষ্টা করছে।"

রোহিণীবাবু অত্যন্ত সহানুভূতিসূচক কোমল স্বরে বলিলেন, "কী ছেলেমানুষ এরা! যারা কামান বন্দুক দিয়ে পৃথিবী সংহার করতে পারে, দুই চারটী রিভলভার বন্দুক বোমা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যাওয়া! হায়, যদি এদের তীব্র স্বদেশ প্রেম, অদম্য উৎসাহ, অসাধারণ কর্ম্ম শক্তি—ঠিক পথে চালিত হতো—"

নরেশ কোন উত্তর দিল না। রোহিণী বাবু যেন আপনার মনেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমার মনে হয় নরেশ, অনর্থক শক্তির অপব্যয় ক'রে লাভ কি? যদি তোমার মত ধীরবুদ্ধি যুবকের সহায়তা পেতাম, তবে এই আত্মঘাতী বিদ্রোহের পথ থেকে এদের ফিরিয়ে আনতেম।"

নরেশ ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"ফিরিয়ে এনে একেবারে হরিণবাড়ী কি আন্দামানে কৃচ্ছ সাধন করতে পাঠিয়ে দিতেন না কি! রোহিণী বাবু, আপনার অসীম দয়া, কিন্তু এ 'দয়ার মিশনে' আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না; কেন না, দেশের উপকার করবার বা দেশকে স্বাধীন করবার বাতিক আমার মোটেই নেই। নিজের যাতে দুটো অন্ন হয়, তাই করে উঠ্‌তে পারছি না!"

রোহিণী বাবু সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—"তা ঠিক বটে! তবে তাড়াতাড়ি কিছু নেই। কথাটা তুমি ভেবে দেখো। একজন দেশ-প্রেমিক লক্ষপতি ধনী—যিনি আড়ালে থেকেই কাজ করতে চান,—বোমা পিস্তল গুপ্তহত্যা দেশ থেকে দূর করবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত আছেন। তাঁর ইচ্ছা, এ সব গুপ্তপথ পরিত্যাগ ক'রে, আমরা সোজা সরল পথে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাই। তুমি যাই বল, কথাটা ভেবে দেখবার মতো বটে!—তাঁর উদ্দেশ্যও মহৎ। যদি কোন দিন কথাটা তোমার মনে লাগে, দেশের যথার্থ সেবা করবার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে জানিও।"

নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যে আজ্ঞা, তবে এতটা দেশপ্রেমিক হয়ে উঠতে পারবো, তাতো মনে হচ্ছে না।"

অদূরে একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল, গভীর নিশীথে সে গম্ভীর শব্দে নরেশ ও রোহিণীবাবু উভয়েই একটু চমকিয়া উঠিলেন।

---

## বিংশ পরিচ্ছেদ

কিশোর ও অনিন্দিতার মধ্যে প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা এখনও সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। দূরস্থিত জ্যোতিষ্ককে মানুষ যেমন দুরধিগম্য বলিয়া জানে, কিশোর এই শিক্ষিতা তরুণীকে তেমনি ভাবেই দেখিত। পূজারী যেমন মন্দিরমধ্যবর্ত্তিনী দেবী প্রতিমাকে সসম্ভ্রমে মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, কিশোর আপনার হৃদয়ের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য এই জীবন্ত দেবী প্রতিমাকে দূর হইতে সেইরূপ ভাবেই জানাইত। অনিন্দিতার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে সে সাহস পাইত না, নিতান্ত প্রয়োজনে বাধ্য না হইলে, তাহার সঙ্গে কথা কহিত না। সে যে কুলী,—অশিক্ষিত, মূর্খ, অজ্ঞ,—পাছে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে, হয়ত অনিন্দিতা তাহাকে একটা অসভ্য বর্ব্বর মনে করিবে, এই ভয়ই তাহার মনে জাগিত।

অনিন্দিতা এই অপরিচিত প্রিয়দর্শন তরুণ যুবককে প্রথম হইতেই কেমন একটা প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিল। কিশোরের সেই দীর্ঘ, উন্নত, বলিষ্ঠ শরীর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক উন্নত ললাট,—দেখিয়া তাহার মনে হইত,—যে সে সাধারণ যুবকদের একজন নহে, তাহার মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত কি একটা প্রচণ্ড তেজ লুকাইয়া আছে। বয়সের অনুপাতে মুখমণ্ডল একটু বেশী বিষণ্ণ গম্ভীর,—জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট বিপদের ঝড় ঝঞ্ঝা এই বয়সেই যে তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা জানাইয়া দিত। আর সেই আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু, তাহার মধ্য দিয়া দর্পণের মতো হৃদয়ের প্রত্যেকটী রেখা যেন প্রকাশ পাইত;—অনিন্দিতার মনে হইত, সে হৃদয়ে কুটিলতা আবিলতা নাই, ভীরুতা কাপুরুষতা নাই,—সহজ সত্যের বলে সে বলীয়ান।

অনিন্দিতা ভাবিত,—এই বলিষ্ঠ তরুণ যুবক, এমন প্রতিভাব্যঞ্জক যাহার মুখশ্রী, সে কোন দুর্ভাগ্যবশে, জীবনে কুলীগিরি করিতে বাধ্য হইল? সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার যাহার দাবী, সে জীবনের আরম্ভেই এরূপ ভাবে উপেক্ষিত হইল কেন? যতই সে এই সব কথা ভাবিত, ততই তাহার মন একটা গভীর বেদনা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিত। এক একবার তাহার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইত, কিশোরের বাপ মা গৃহ পরিবার আছে কিনা, কেমন করিয়া তাহাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইল। কিন্তু একটা স্বাভাবিক লজ্জা ও সঙ্কোচ আসিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করিত।

বাগানের সম্মুখে যে বারান্দা, তাহার একটা কোণের ঘরে কিশোর থাকিত। মোহিত যখন কলেজে যাইত, তখন এইটা তাহার পড়িবার ঘর ছিল। ঘরটীতে আসবাব পত্র কিছুই ছিল না, কিশোরেরও জিনিষপত্র পোষাক পরিচ্ছদের কোন বালাই ছিল না। তাহার শয্যার মধ্যে ছিল একখানা পুরাতন দেশী কম্বল। কিন্তু সেদিন সেই কম্বল শয্যায় শুইয়াই কিশোর এক মধুময় স্বপ্ন দেখিল। দেখিল—সে যেন একটা বন্ধুর দুর্গম পার্ব্বত্য পথ বাহিয়া উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করিতেছে, এমন সময়ে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ডে আহত হইয়া আপনার ভার কেন্দ্র হারাইয়া গড়াইতে গড়াইতে বিশ হাত নীচে একটা গহ্বরে পড়িয়া গেল। কতক্ষণ যে মূর্চ্ছিত অবস্থায় ছিল, তাহা সে জানে না। কাহার মধুর কণ্ঠস্বরে চেতনা পাইয়া দেখিল, একটা তরুণী তাহার শিয়রে বসিয়া ললাটে হাত বুলাইয়া বলিতেছে—"শ্রান্ত পথিক, ওঠ, ভয় নাই"। এ কণ্ঠস্বর যেন কিশোরের পরিচিত, তরুণীকে যেন সে কোথায় দেখিয়াছে, কিন্তু তবু ঠিক চিনিতে পারিল না। কিশোর যেন কোন মন্ত্র বলে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সস্মিতবদনা তরুণীর প্রসারিত হস্ত ধরিয়া নববলে বলীয়ান হইয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গে কিশোর দেখিল, সত্যই তরুণী অনিন্দিতা তাহার গৃহের মুক্ত দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া।

অনিন্দিতা সহজকণ্ঠে বলিল—"কিশোর বাবু, এমনি ভাবে শুয়ে আপনার ঘুম হয় কি ক'রে, তাই আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি। মা কত বল্‌ছেন বালিশ বিছানা নিতে, কিন্তু আপনার ওই এক জেদ—"

কিশোর ততক্ষণ উঠিয়া পড়িয়াছিল; ঈষৎ লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিল—"আমরা কুলী মজুর কি না, তাই এমনই অভ্যাস। ভাল বালিশ বিছানা হলেই হয়ত আরো ঘুম হবে না।"

"সে একটা কথাই নয়। আমি আর আপনার আপত্তি শুনবো না। আপনি দেখ্‌ছি, দাদারই মত খেয়ালী মানুষ।"

পর দিন কিশোর সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার ক্ষুদ্র কক্ষের সজ্জা সম্পূর্ণ নূতন হইয়া গিয়াছে। কাপড় চোপড় রাখিবার জন্য একটা ছোট আলনা আসিয়া হাজির হইয়াছে; একধারে ছোট একটা টেবিল, অন্যধারে একটা খাট, তাহার উপর শয্যার সরঞ্জাম।

অনিন্দিতার সঙ্গে দেখা হইলে কিশোর বলিল—"আপনি এ সব কি করেছেন? মুটে মজুরের ধাতে ও-সব সহ্য হয় না। কত দিন গাছতলায় ইট মাথায় দিয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছি,—এ যে অনেক কালের অভ্যাস।"

কিশোর আপনার অজ্ঞাতসারেই একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

অনিন্দিতা হাসিয়া বলিল—"অভ্যাসটা একটু বদলালেন-ই বা—তাতে কিছু ক্ষতি হবে না।"

কিশোর কিন্তু তাহার অভ্যাস বদলাইতে পারিল না। প্রথম দুই এক দিন খাটের উপর কোমল শয্যায় শুইয়া দেখিল, রাত্রে সত্যই তাহার ঘুম হয় না। তখন সে তাহার পুরাতন কম্বলখানি লইয়া বিনা উপাধানেই পূর্ব্ববৎ ভূমিতেই শয়ন করিতে লাগিল।

কিশোর কোথাও একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিতেছিল। একদিন প্রচণ্ড-রৌদ্রে পথে পথে ঘুরিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সে বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইল। অনিন্দিতা যেন তাহারই প্রতীক্ষায় বাহিরের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া ব্যথিত ভাবে বলিল—"মাগো, আপনার মুখ চোখ যে রোদে পুড়ে লাল হয়ে উঠেছে, সমস্ত শরীরে ঘাম ঝরছে! এত রোদ্দুরে কোথায় বেরিয়েছিলেন? কি সর্ব্বনাশ! স্থির হয়ে বসুন!"—

অনিন্দিতা তাড়াতাড়ি একটা পাখা লইয়া কিশোরকে বাতাস করিতে লাগিল।

কিশোর অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—"না—না, আপনাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না। যারা রোদে পুড়ে মোট বয়, পাথর ভাঙ্গে, তাদের কি এতে কষ্ট হয়?"

অনিন্দিতার মুখে বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিল; কোন কথা না বলিয়া সে পাখাখানা রাখিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

কিশোর ভাবিল—উনি কি রাগ করিয়া গেলেন?—আমার ও-কথা গুলা বলা ভাল হয় নাই। নিজের রূঢ় ব্যবহার কল্পনা করিয়া কিশোরের মন অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। সে যে এই সুশিক্ষিতা তরুণীর সঙ্গে কথা বলিতে জানে না, ইহাই কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু অনিন্দিতার যে রাগ বা বিরক্তি হয় নাই, একটু পরেই তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। অনিন্দিতা এক গ্লাস বরফ দেওয়া সরবৎ হাতে করিয়া আসিয়া বলিল—"এইটুকু খেয়ে ফেলুন দেখি, শরীরটা ঠাণ্ডা হবে।"

কিশোর এবার আর ভয়ে কোন আপত্তি করিতে পারিল না।

এমনি করিয়াই এই দুই তরুণ তরুণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অনিন্দিতার কেবলই মনে হইত, আহা, এই নিসঙ্গ আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব হীন যুবকটী জীবনে কত দুঃখ সহ্য করিয়াছে,—তাহার

একটুখানি সেবায় যদি কষ্টের লাঘব হয়। বিশেষতঃ সে তার দাদার বন্ধু, দাদা অতিথি সেবার ভার বিশেষ করিয়া তাহার উপরেই দিয়াছে।

কিশোর এই শিক্ষিতা তরুণীর সেবা গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত—কিন্তু তবু জোর করিয়া আপত্তি করিতে পারিত না,—পাছে তাহার অসৌজন্যে, রূঢ় আচরণে অনিন্দিতা মনে ব্যথা পায়। ক্রমে তাহারও সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া গেল।

( ২ )

অপরাহ্নে অনিন্দিতা মোহিতের বসিবার ঘরে জানালার ধারে বসিয়া একখানি ইংরাজী বহি পড়িতেছিল। কিশোর মোহিতের সন্ধানে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াই অনিন্দিতাকে দেখিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে ফিরিয়া আসিতেছিল। অনিন্দিতা পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল— "অমন চুপি চুপি পালাচ্ছেন যে, কিশোরবাবু!"

"মোহিত-দাকে খুঁজছিলাম, একটা জরুরী কথা ছিল।"

"দাদা তো সেই সকাল থেকে কোথায় বেরিয়েছে। আপনি একটু বসুন না"—বলিয়া অনিন্দিতা একখানি চেয়ার আগাইয়া দিল।

কিশোর ইতস্ততঃ করিতেছিল। অনিন্দিতা হাসিয়া বলিল—"চেয়ারে বস্‌তেও কি আপনার আপত্তি?"

কিশোর আর কিছু না বলিয়া চেয়ারখানি একটু দূরে টানিয়া লইয়া বসিল।

সারা দিনের তীব্র দাহের পর তখন সবে-মাত্র রৌদ্রের তেজ একটু কমিয়াছে, দক্ষিণের খোলা মাঠ হইতে জোরে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে বাতাস কতকটা তৃষ্ণার জলের মতোই স্নিগ্ধ। পবনান্দোলিত বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর শব্দ ঘুম পাড়ানিয়া গানের মতই মধুর শোনাইতেছে।

কিশোর ও অনিন্দিতা উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, যেন পরস্পরের সঙ্গসুখের মাধুর্য্য নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহারা গ্রহণ করিতে লাগিল।

অবশেষে অনিন্দিতাই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—"কিশোর বাবু, আপনার মুখে কুলী মজুরদের দুঃখময় জীবনের কথা প্রায়ই শুনি ; কিন্তু আমাদের দেশের বড় বড় লোকেরা, দেশের নেতারা. তাদের কথা নিয়ে কোনই আলোচনা করেন না ; বোধ হয় তাঁরা মনে করেন, ওদের তুচ্ছ জীবনেব কথা ভেবে অনর্থক সময় নষ্ট করে কি হবে ! কিন্তু এই দেখুন, একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, সে দেশের শ্রমিকদের কথা, মুটে মজুর কৃষকদের কথা লিখেছেন। পড়লেই মনে হয়, তাদের কথা তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, বোধ হয় কত বিনিদ্র রজনী তিনি কেবল তাদের কথাই ভেবেছেন ! কিশোরবাবু, আপনার কি মনে হয়, আমাদের দেশের কৃষক শ্রমিকদের তরফ থেকে কিছু বলবার নেই ?"

কিশোর ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"দেখুন, ও সব ভেবে দেখবার মত বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু কুলী মজুরদের জীবনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে, নিজে মজুরী করেছি। মনে হয়, তাদের যেমন কষ্ট, এমন বোধ হয় জগতে আর কারু নেই। সারা দিনরাত খেটে গায়ের রক্ত জল করে, তারা যে দু চার পয়সা পায়, তাতে তাদের ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত দুবেলা খেতে পায় না। কেবল ধার ক'রে, পরের দয়ার উপর নির্ভর ক'রে কোন রকমে তারা বেঁচে থাকে মাত্র। কেন এমন হয়, এত খেটেও তারা দুবেলা খেতে পায় না কেন ?"

অনিন্দিতা চিন্তিত ভাবে বলিল—"কেন হয় ? এই বইতে সেই কথাই লেখা হয়েছে। এত লোক হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটেও খেতে পায় না ; আর কতকগুলো লোক বিনা পরিশ্রমে বা স্বল্প পরিশ্রমে, পায়ের উপর পা

দিয়ে দিব্য আরামে বসে খাচ্ছে, ছড়াচ্ছে, নানা বাজে বিলাসব্যসনে অপব্যয় করছে, এর কারণ কি ? এর কারণ, কতকগুলি লোক গায়ের জোরে বা কূটবুদ্ধির জোরে একটু বেশী সুবিধে করে নিয়েছে, দুনিয়ার যত সম্পত্তি, ধন-দৌলত সব এক জায়গায় জমা করে পর্ব্বত প্রমাণ ক'রে তুলেছে। আর যারা দুর্ব্বল, সরল প্রকৃতির লোক,—তাদের বঞ্চিত করে দাবিয়ে রেখেছে, তাদের দিয়ে পশুর মত দিন রাত খাটিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু ন্যায়তঃ তাদের যা প্রাপ্য তা দিচ্ছে না।"

কিশোর একটু বিস্মিত ভাবে বলিল—"কিন্তু যারা বড় লোক, ধনী. জমিদার, মহাজন—অর্থ সম্পত্তি, ধনদৌলত সব তাদেরই তো, হয়, তাদের নিজের—নয় তো বাপ ঠাকুরদাদার। তারা সকলে গরিব লোককে ঠকিয়ে নিচ্ছে, তাতো বোধ হয় না।"

অনিন্দিতা মৃদু হাসিয়া—হাতের বইখানির পাতা উল্টাইয়া এক জায়গায় পড়িয়া, বলিল—"এই দেখুন, ইনি কি বলছেন। অর্থ বা সম্পত্তি কারু বংশগত নয়, ভগবান সঙ্গে করে পাঠিয়ে দেন নি। যে যেমন পরিশ্রম করবে, অর্থ সম্পত্তিতে তার তেমন অধিকার। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সমাজে আমরা তার বিপরীত দেখ্‌ছি। কতকগুলি লোক বাপ ঠাকুর-দাদার সম্পত্তি বা চুরি ডাকাতি ক'রে জমানো সম্পত্তি পেয়ে ফেঁপে উঠেছে, অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে সকলকে চোখ রাঙাচ্ছে,—দুই হাতে সেই সম্পত্তি খোলামকুচির মত ছড়াচ্ছে ;—আর লক্ষ লক্ষ লোক নিরুপায় ভাবে তাদের মুখের দিকে চেয়ে আছে, তারা পরিশ্রম করেও ক্ষুধার অন্ন পাচ্ছে না,—ভোগ বিলাস ঐশ্বর্য্য তো দূরের কথা! কিন্তু এরাই কি ধনসম্পত্তির প্রকৃত মালিক নয় ? তাদেরই দেহের বিন্দু বিন্দু শোণিত দিয়ে ঐ সব সম্পত্তি কি গড়ে ওঠেনি ? তারা কারখানায় হাতুড়ি পিটে, খাদে মাটী কেটে, কয়লা কেটে, বা পাথর ভেঙ্গে—মাল তৈরী করছে, আর

ধনীরা সেগুলো বিক্রী করে আরও বড় মানুষ হচ্ছে ;—তারা রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় করে মাঠে জমি চষছে, বীজ বুনছে, ফসল জন্মাচ্ছে ;—আর ওরা তারই উৎপন্ন অর্থ দিয়ে গাড়ী জুড়ী মোটর হাঁকাচ্ছে, সমাজের বুকের উপর বসে নানা অত্যাচার অনাচার করছে। এ কি প্রবঞ্চণা, প্রতারণা নয়, ঘোর অন্যায় বৈষম্য নয় ? এ বৈষম্য যতদিন থাকবে, ততদিন সমাজে দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য দূর হবে না !”

কিশোর ভাবিতে লাগিল। এসব তো খুবই সোজা কথা, কিন্তু এসব কথা তো পূর্ব্বে সে ভাবে নাই। তবে এই দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যের জন্য সে-ই একাকী দায়ী নহে ?—তার দরিদ্র পিতা, চিরদুঃখিনী মাতা যে—

কিশোর আর ভাবিতে পারিল না, তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। কে যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া বুকের উপর একটা পাষাণভার চাপাইয়া দিল।

অনিন্দিতা একদৃষ্টে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কিশোরের মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করিয়া বলিল—

“কিশোরবাবু, কি ভাবছেন আপনি, আপনার কি এসব দুঃখের কথা শুন্‌তে কষ্ট হচ্ছে ?”

কিশোর অতীতের অন্ধকার রাজ্যের মধ্যে অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিল, অনিন্দিতার কথায় সুপ্তোত্থিতের মত হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল ; ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল—

“না—না—কিছু নয়। আপনার মুখে ও-বই শুন্‌তে আমার খুবই ভাল লাগছে ; আপনি যেমন সুন্দরভাবে ও-সব কঠিন কথা আমার মত অজ্ঞ লোককেও বোঝাতে পারেন—”

অনিন্দিতার মুখ ঈষৎ রাঙা হইয়া উঠিল,—সলজ্জ হাস্যের সঙ্গে বলিল, —“থাক, আমার গুণপণার আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। আপনি অজ্ঞ,

কে একথা আপনাকে বল্‌লে ? বই পড়েননি বলে ? কিন্তু বই-পড়া বিদ্যার চেয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্য যে অনেক বেশী ! আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত থাক, কাল আবার আপনাকে পড়ে শোনাব।”

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। সূর্য্যাস্তের শেষ রক্তিমা পশ্চিম আকাশের প্রান্তে সোণালী মেঘে তখনও অঙ্কিত হইয়াছিল। সহরের ধূলি ধূসর ম্লান রাজপথে, গৃহে গৃহে গবাক্ষপথে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিতেছিল, অন্ধকার আশ্রয়চ্যুত হইয়া বৃক্ষতলে, বৃহৎ অট্টালিকার পার্শ্বে বা সরু গলিতে আশ্রয় লইতেছিল। নিষ্ঠাবান হিন্দুগৃহস্থের বাড়ীতে—দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ;—বিশ্বনাথের আরতির এই তো সময়। কিশোর ও অনিন্দিতার কর্ণে সেই গম্ভীর ধ্বনি বড়ই স্নিগ্ধ, বড়ই মধুর বোধ হইতে লাগিল।

---

## একবিংশ পরিচ্ছেদ

এই কয়মাসের মধ্যে প্রতিমার চেহারার কী ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে! তাহার লাবণ্যময় মূর্ত্তি ক্ষীণ দীপশিখার মতো অথবা নিদাঘতাপশুষ্ক বল্লরীর মতই কৃশ হইয়া গিয়াছে। চক্ষের সে মাধুর্য্যময় দীপ্তি ক্লান্ত, দেহের কান্তি ম্লান। তাহার মনোরাজ্যে অহর্নিশি যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, বাহিরে তাহারই সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছিল। পড়াশুনায়, কাজকর্ম্মে, এমন কি বন্ধুদের সঙ্গে হাস্যপরিহাসে—তাহার আর সে উৎসাহ নাই,—বহির্জগৎ হইতে দূরে সরিয়া সে যেন সর্ব্বদা কি এক গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিত।

মেয়ের এই মনের অবস্থা স্নেহময় পিতার উদ্বেগ ব্যাকুল দৃষ্টি এড়ায় নাই; কিন্তু কি করিলে যে মেয়ের মনে শান্তি ফিরিয়া আসিবে, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলেন না। মা মেয়ের মনের ভাব কতকটা ধরিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বামীর নিকট সে কথা বলিতে সাহস পান নাই। বিশেষতঃ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, প্রতিমা এখন যতই ছেলেমানুষী করুক, একবার শুভকার্য্যটা হইয়া গেলে ওসব মনের গোলমাল কাটিয়া যাইবে। সুবোধের মত ছেলে, আজকালকার দিনে কয়টী পাওয়া যায়? প্রতিমার যদি এমন বরকেও পছন্দ না হয়, তবে তাহারই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে!

সুবোধ পূর্ব্বের মতই এ বাড়ীতে আসিত, প্রতিমার বাবার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিত, মার নিকট হইতেও পূর্ব্বের মত নিঃসঙ্কোচে চাহিয়া খাইত। কিন্তু প্রতিমার সঙ্গে তাহার বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ হইত না। প্রতিমা যথাসম্ভব তাহাকে এড়াইয়া চলিত। সুবোধের গলার আওয়াজ পাইলেই, সে তাড়াতাড়ি উপরের ঘরে যাইয়া সেলাই লইয়া

বসিত অথবা গভীর মনযোগের সঙ্গে তুলি লইয়া ছবি আঁকিতে সুরু করিত। সুবোধকে চা-খাবার দিবার জন্য মা অনেক ডাকাডাকি করিলেও সে সহজে নড়িত না ; শেষে মা যখন ধৈর্য্য হারাইয়া তিরস্কার আরম্ভ করিতেন, তখন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে উঠিয়া আসিত।

সুবোধ প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত, কতক্ষণে জগতের মধ্যে সুন্দরতম একখানি মুখ, বলয়মণ্ডিত সুগোল নিটোল হাত দুখানিতে অমৃতের পাত্র বহিয়া, তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে, বিশাল আয়তলোচনের লাজনম্র দৃষ্টি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিবে! কিন্তু অনেকদিনই তাহার সে আশা পূর্ণ হইত না, অতৃপ্ত হৃদয়েই তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইত। সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হইত না, কেবলই মনে হইত,—আমি কি অপরাধ করিয়াছি, আমার উপর প্রতিমা কেন এত বিমুখ হইয়া উঠিল ?

অবশেষে অনেক চিন্তার পর, সুবোধ মনে মনে সুঙ্কল্প করিল, এই অসহ্য যন্ত্রণার অবসান করিতে হইবে, একদিন প্রতিমাকে স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিবে, তাহার ইচ্ছা কি। যদি বিধাতা সুবোধের প্রতি নিতান্তই নিষ্ঠুর হন, যদি প্রতিমা প্রত্যাখ্যানের বজ্র দণ্ড তাহার উপর নিক্ষেপ করে, তবে বুক পাতিয়া সেই দণ্ডই সে গ্রহণ করিবে, বেদনা যতই তাহার পক্ষে অসহ্য হোক!

( ২ )

দেখিতে দেখিতে একবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রতিমার জন্ম-তিথির দিন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এবারকার জন্মতিথিতে পূর্ব্বের সেই উচ্ছল আনন্দ হাস্যকৌতুকময় উৎসব নাই ; মেঘাবৃত আকাশের মত সবই যেন একটু থমথমে, ঈষৎ উদ্বেগের ছায়াচ্ছন্ন। বেশভূষা প্রসাধন করিবার জন্য প্রতিমার নিজের মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কেবল মায়ের

পীড়াপীড়িতে ও পিতার নীরব তিরস্কারে তাহাকে বাধ্য হইয়াই সেদিকে একটু মন দিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেই তাহার সহজ সৌন্দর্য্য কী মনোহররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সদ্যস্নাতা, পৃষ্ঠে অসংবদ্ধ এলায়িত কেশরাশি, ললাট চন্দনচর্চ্চিত, ক্ষীণ কৃশতনু, মুখে সহিষ্ণুতার ছায়া,—যেন তপস্যারতা কুমারী উমা এইমাত্র শিবপূজা হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন!

জন্মতিথি পূজার পর প্রতিমা মাকে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করিল; মা মুগ্ধ-দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ মেয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে একটী ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"যাও, তোমার বাবাকে প্রণাম করে এস।"

প্রতিমা ধীরপদে পিতার বসিবার ঘরে যাইয়া দেখিল, তিনি সুবোধের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। সুবোধ যে কখন আসিয়াছে, আজ প্রতিমা তাহা জানিতে পারে নাই। তাই হঠাৎ তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া সে যেন ঈষৎ চমকিত হইয়া উঠিল, তাহার কর্ণমূলে রক্তিম রেখা দেখা দিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেভাব দমন করিয়া প্রশান্ত মুখে নত হইয়া পিতার চরণদ্বয় স্পর্শ করিল।

করুণাবাবু কন্যার মাথায় হাত দিয়া মনে মনে কি যেন আশীর্ব্বাদ করলেন, তারপর সহাস্যবদনে বলিলেন—"সুবোধকেও প্রণাম কর মা।"

একমুহূর্ত্তের জন্য প্রতিমার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন মন্দ হইয়া আসিল। কিন্তু বলবান আরোহী যেমন জোরে বল্গা কষিয়া দুর্দ্দান্ত অশ্বকে সংযত করে, প্রতিমা তেমনই ভাবে আপনার অবাধ্য হৃদয়কে সংযত করিল।

সুবোধের দিকে অগ্রসর হইতেই, সে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"সে কি, উনি আমাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবেন কেন—না—না—"

প্রতিমা ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে ম্লান হাসিয়া মস্তকে দুই কর যুক্ত করিয়া সুবোধকে নমস্কার করিল।

করুণা বাবু প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোমার এবারকার জন্মতিথিতে সর্ব্বাগ্রে সুবোধই যে তোমাকে স্নেহের উপহার দিচ্ছে, এতে আমি বড়ই আনন্দিত হয়েছি। সুবোধ ছেলেমানুষ হলেও তার রুচির প্রশংসা করতে হবে।" বলিয়া টেবিল হইতে একখানি সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো ছবি টানিয়া তাহার আবরণ খুলিয়া প্রতিমার সম্মুখে ধরিলেন।

ফ্রেমের নীচে সোনার জলে বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা—"শ্রীমতী প্রতিমা দেবী।" ছবিখানি কোন উদীয়মান নবীন ভারতীয় শিল্পীর আঁকা, এককোণে পরিচয় লেখা আছে—"জীবন নদীর কুলে"। বিশালকায়া স্রোতস্বিনী,—তরঙ্গভঙ্গ-বঙ্কিম, ফেন শুভ্র বারিরাশি বহিয়া যাইতেছে, দুইতীরে বনরাজি বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত, তাহারই পশ্চাতে দূরে—অতিদূরে, পর্ব্বতের উপরে মন্দির চূড়া দেখা যাইতেছে,—তাহার শীর্ষে মেঘখণ্ড ক্রীড়া করিতেছে। স্রোতস্বিনীর কুলে ছোট একখানি নৌকা, নৌকায় একজন যুবক বসিয়া আছে, তাহার দৃষ্টি হর্ষোৎফুল্ল। যুবকের একহাতে বৈ... অন্য হাত বাড়াইয়া একটী তরুণীকে নৌকায় তুলিতে চেষ্টা করিতে... কিন্তু তরুণী যেন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়, তাহার দৃষ্টিতে ঈষৎ উদ্বেগের রে... ফুটিয়া উঠিয়াছে।

করুণা বাবু প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"কেমন মা, ছবিখা... বেশ এঁকেছে নয়?"

প্রতিমা তন্ময়ভাবে ছবিখানি দেখিতেছিল, পিতার কথায় যেন ঈষ... চমকিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল—"হ্যাঁ বাবা"!

করুণাময় বাবু সস্নেহ হাস্যে প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আ... এখনি আসছি মা, তোমার মাকে একটা কথা বলে।"

( ৩ )

করুণাময় বাবু চলিয়া গেলে, প্রতিমা ও সুবোধ উভয়েই নির্ব্বাক হইয়া রহিল। উভয়েরই হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল,—একজনের শঙ্কা ও সঙ্কোচে, আর একজনের লজ্জা ও আনন্দে। কেহই সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কথা আরম্ভ করিতে সাহস পাইতেছিল না। প্রতিমা মাটীর দিকে চক্ষু নত করিয়াছিল, আর সুবোধ ছিল তাহারই দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া।

কিছুক্ষণ পরে সুবোধই সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—

"প্রতিমা, এই ছবিখানি তোমার জন্মতিথিতে উপহার দেব বলে, শিল্পী বন্ধুকে অনেক সাধ্যসাধনা করে আঁকিয়েছি। এখানি ঠিক আমাদের জীবনের চিত্রই হয়েছে। জীবন নদীর কূলে দাঁড়িয়ে, আজ আমি তোমাকে পাবার আগ্রহে ব্যাকুল, কিন্তু মনে হয়, তুমি এখনো তোমার মন স্থির করতে পারনি। এ তোমার কিসের দ্বিধা, কিসের আশঙ্কা— আমাকে কি খুলে বলবে প্রতিমা ?"

প্রতিমা সুপ্তোত্থিতের মত মাথা তুলিয়া একবার সুবোধের দিকে, একবার চিত্রখানির দিকে চাহিল। পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল, গত বর্ষের জন্মতিথির কথা। তাহার সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে সুবোধের দিকে চাহিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—

"সুবোধ বাবু, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আপনার এই অমূল্য স্নেহের যোগ্য নই—"

সুবোধের মুখের উপর বেদনার ছায়া পড়িল, কিন্তু সে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—"সে বিচারের ভার তো তোমার উপর নয়, প্রতিমা। রত্ন তো নিজের মূল্য জানে না, খনিকারই সেটা ভাল বোঝে।

এই দীর্ঘকাল ধরে আমি যে তোমারই জন্য সাধনা করেছি, তোমারই জন্য প্রতীক্ষা করে আছি। তোমাকে না পেলে আমার জীবন সার্থক হবে না, এতদিন ধরে যে আশার মন্দির গড়েছি, তা ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাবে। বল প্রতিমা—"

প্রতিমা কোন উত্তর দিল না, নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুবোধ আবার বলিল—"বল, প্রতিমা, আমাকে এই সংশয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে।"

এবার প্রস্তর মূর্ত্তির ওষ্ঠ কম্পিত হইল, ক্লান্তদৃষ্টি ভূমিতলে নামাইয়া যেন আপন মনেই বলিল—"উপায় নেই—উপায় নেই! আমার ব্রত যে ভিন্ন, এ দীর্ঘ জীবনের পথে আমি একাই চলতে চাই—"

সুবোধ কিছুক্ষণ বজ্রাহতবৎ অসাড় হইয়া রহিল। তাহার সমস্ত মুখ পাংশু, রক্তশূন্য। অবশেষে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বলিল—"প্রতিমা—মানুষ দীর্ঘদিনের সাধনায় যে আশার মন্দির গড়ে তোলে, তা যদি হঠাৎ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, তবে তার কী অবস্থা হয়, কল্পনা করতে পার কি? শিল্পী হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে যে সৃষ্টি করে, তা যদি একদিনে একমুহূর্ত্তে আগুনে পুড়ে ভস্মসাৎ হয়, তবে তার পক্ষে জীবন ভার কি দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে, বুঝতে পার কি? তা যদি বুঝতে, তবে—"

"সুবোধ বাবু এসব কি বলছেন, আপনি! আমার মতো সামান্য একজন মেয়ের জন্য আপনার মহৎ জীবন ব্যর্থ হবে কেন? বিদ্যাবুদ্ধি প্রতিভায় কত বড় শক্তিশালী আপনি,—আপনাকে সুখী করতে পারে, এমন সৌভাগ্যবতীর তো অভাব নেই! আমি আপনাকে বড় ভাইয়ের মত ভক্তি করি, চিরদিনই করবো। ছোট বোনের এই প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করবেন। আজ আমার জন্মতিথিতে আশীর্ব্বাদ করুন, জীবনের দীর্ঘ পথ

যদি ভগবানের বিধানে কঙ্করময়ই হয়ে ওঠে, দৃঢ়পদে তা অতিক্রম করবার শক্তি যেন লাভ করি।”

সুবোধ অনেকক্ষণ শূন্য মনে বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সেখানে মেঘলোকে আকাশশিল্পীর খেলা চলিতেছিল। এক একবার শূন্যে পাহাড়, মন্দির, দুর্গ গড়িয়া উঠিতেছে। আবার পরক্ষণেই সেগুলি ভাঙ্গিয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। এই কি তবে জীবনেরও পরিণতি? মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা কি বিধাতার নিষ্ঠুর খেয়ালে এইরূপ ভাবেই শূন্যে মিলাইয়া যায়?

সুবোধ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—সে কণ্ঠ কী বেদনাময়, অন্তরের অব্যক্ত হাহাকার যেন তাহার মধ্য দিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—

“প্রতিমা যে কেবল সাধনায় সিদ্ধিই লাভ করতে চায়, ব্যর্থতার আঘাত সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত নয়, সে অতি দীন। আমি তোমার হস্তনিক্ষিপ্ত বজ্রদণ্ডই বুক পেতে গ্রহণ করতে চেষ্টা করবো। তুমি সুখী হও—”

তারপর প্রতিমার নিকট হইতে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রতিমা চিত্রার্পিতের মত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথাই বলিতে পারিল না।

---

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অনিন্দিতা তাহাদের মহিলা সমিতির বার্ষিক সভার জন্য একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিল। মোহিতকে সেইটা পড়িয়া শুনাইবার জন্য সে কয়েকদিন ধরিয়া নানারূপ স্তবস্তুতি করিতেছিল, কিন্তু দুই দণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ শুনিবার মত ধৈর্য্য মোহিতের ছিল না। সে বলিল—"রক্ষা কর দিদি, ওর চেয়ে তুই যদি আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিতিস, তাহলে-ও ঢের বেশী খুসী হতেম।"

অনিন্দিতা রাগ করিয়া বলিল—"আর কখনো আমি তোমাকে কিছু অনুরোধ করবো-না, দাদা! আমার সব কথাই তুমি এমনি লঘুভাবে উড়িয়ে দাও। বিষয়টা কেমন গুরুতর, তা যদি তুমি বুঝতে—"

"বুঝি বলেই তো রাজী হতে সাহস হচ্ছেনা, কেননা অমন গুরুতর বিষয় বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। তার চেয়ে বরং যদি তোদের মহিলা সমিতির জন্য চাঁদা সংগ্রহের ভার দিতিস, তাহলে উৎসাহ হ'ত। ও জিনিষটা মোটেই নীরস নয়,—প্রমাণ, এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশে যারা সাধারণেব হিতার্থে চাঁদাসংগ্রহ করেছে, তারা সকলেই পরের হিত না হোক, অন্ততঃ নিজের হিত যথেষ্ট পরিমাণেই করতে পেরেছে।"

অনিন্দিতা অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—"তোমার আর ব্যাখ্যান করতে হবে না দাদা! আচ্ছা, প্রতিমা যদি তোমাকে কোন অনুরোধ করতো, তুমি কি তা ঠেলে ফেলতে পারতে?—কখনই না।"

প্রতিমার কথায় মোহিতের মুখে বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে শুধু একটু ম্লান হাসির মধ্য দিয়া অনিন্দিতার কথার জবাব দিল।

অনিন্দিতার তীক্ষ্ণ চক্ষু তাহা এড়াইল না। সে কি ভাবিয়া বলিল—

"তুমি কি শুনেছ দাদা, প্রতিমার সঙ্গে সুবোধ বাবুর বিয়ের যে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, তা ভেঙ্গে গিয়েছে !"

মোহিত বিস্মিত ভাবে বলিল—"কেন ভেঙ্গে গেল, সুবোধ ছেলেটাতো মন্দ নয় !"

"সুবোধ ছেলেটা মন্দ না হতে পারে। কিন্তু প্রতিমা বেঁকে দাঁড়িয়েছে, বলছে, সে বিয়েই করবে না।"

"—কেন, সে কি তোর চেলা হয়েছে নাকি ?"—বলিয়া মোহিত লঘু-ভাবে হাসিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু অনিন্দিতার নিকটে সে হাসি অশ্রুরই রূপান্তর বলিয়া মনে হইল।

অনিন্দিতা একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"দাদা, তোমরা পুরুষ জাতি এমনই অন্ধ বটে ! যদি প্রতিমার হৃদয়ের ভাব বোঝবার ক্ষমতা তোমার থাকতো—"

মোহিত রণে ভঙ্গ দিয়া নীরবে সে ঘর হইতে সরিয়া পড়িল।

কিশোর তাহাদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে কখন যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা অনিন্দিতা লক্ষ্য করে নাই। তাহাকে দেখিতে পাইয়া যেন একটু আশ্বস্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল—

"এই যে কিশোর বাবু, আসুন। দেখলেন তো দাদার কাণ্ড ! তা ভালই হল, আপনাকেই আজ আমি শ্রোতার পদে অভিষিক্ত করবো ; আমাদের দেশের মেয়েদের যে শোচনীয় দুর্দ্দশা, আমার এই লেখায় সেই-টাই বোঝাবার চেষ্টা করেছি।"

কিশোরের মনে হইল, এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইবে। সে বিনাবাক্যব্যয়ে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। অনিন্দিতা আর একখানি আসন টানিয়া লইয়া কিশোরের অদূরে জানলার ধারে বসিল।

অনিন্দিতা যখন মধুর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙ্গলার মেয়েদের বুকভাঙ্গা দুঃখের কথা, শোচনীয় দাসত্বের কথা বর্ণনা করতে লাগিল, তখন কিশোরের সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, চিরদুঃখিনী নিজের মায়ের কথা,—সমস্ত জীবন ধরিয়া কতকষ্ট কত নির্য্যাতনই না তিনি সহ্য করিয়াছেন! অথচ সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী তিনি,—একদিনও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলেন নাই। গৃহে নিত্যই অভাব, নিত্যই অন্নসমস্যা,—যদি বা কোন দিন কিছু জুটিত, স্বামীপুত্রকে দিয়া প্রায়ই তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকিত না, অগত্যা কতদিন তাঁহাকে অনশনেই থাকিতে হইত। তাহার উপর পিতার সে সব অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়া কিশোরের নয়ন অশ্রু-সিক্ত হইয়া উঠিল। কত বিনিদ্র রজনী যে—তাহার মা, পিতার পথ চাহিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন, কিশোরের তো তাহা অজানা ছিল না! সেই তাহার চির দুঃখিনী, সহিষ্ণুতাময়ী স্নেহময়ী মা আজ কোথায়? গঙ্গার অতল গর্ভে?

একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস কিশোরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

অনিন্দিতা সে শব্দে চমকিত হইয়া কিশোরের দিকে উদ্বিগ্ন ভাবে চাহিল। তার পর মমতাপূর্ণ কোমল স্বরে বলিল—

"কিশোর বাবু, কি ভাবছেন আপনি? আমি কয়দিন থেকে লক্ষ্য করে আস্‌ছি, আপনার মনে কোনও গভীর দুঃখ রয়েছে, আপনি অতি কষ্টে তা চেপে রেখেছেন,—যদিও মাঝে মাঝে তারা অবাধ্য হয়ে মাথা নাড়া দিয়ে উঠছে। আমাকে বলবেন না, কি সে তীব্র দুঃখ আপনার?"

কিশোর হঠাৎ আপনাকে সংযত করিয়া ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল—"কিছু নয়, আমাদের মত লোকেরা তো দুঃখ ভোগ করবার জন্যই পৃথিবীতে এসেছে, তবে দুর্ব্বল মন মান্‌তে চায় না—"

"—না, কিশোর বাবু, আমি আজ আর আপনার ও-সব কৌশলে

ভুলছি নে। আমাকে বল্‌তেই হবে আপনার সব কথা। নিজের মনে মনে যে সব কথা পুষে রেখে কষ্ট পাচ্ছেন, আমাকে বল্‌লে হয়ত তার ভার কিছু লঘু হবে।"

কিশোর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কিন্তু সে বড় হৃদয় বিদারক কাহিনী, শুনলে আপনি স্থির থাকৃতে পারবেন না। তার চেয়ে, যা অতীতের তাকে টেনে বের করে এনে লাভ কি? আর সে কাহিনীতে নূতনত্বও নেই কিছু, প্রতিদিনই বাঙ্গালীর ঘরে তা হচ্ছে!"

অনিন্দিতা অভিমান ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলিল—কিশোর বাবু, আপনি আমাকে এত পর মনে করেন? আমার মনের কষ্ট?—আমি কি রাজকন্যা, না, দেবকন্যা যে, মানুষের দুঃখের কথা শুন্‌তে পারবো না?"

কিশোর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে অনিন্দিতার দিকে চাহিল,—দেখিল তাহার মুখে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ—দৃষ্টি স্নেহ মমতায় ভরা। কিশোরের মনে হইল, এ বুঝি সত্যই দেবকন্যা। তাহার মনের কুয়াসা অনেকটা কাটিয়া গেল; সে সেই তরুণীর নিকই, আপনার অতীত জীবনের বেদনাময় ইতিহাস খুলিয়া বলিতে লাগিল।

কিশোর যখন ব্যথিত কণ্ঠে, অথচ ধীর প্রশান্তভাবে আপনার দুঃখময় বাল্যকাহিনী বর্ণনা করিতেছিল;—তাহার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারী পিতার কথা,—চিরদুঃখিনী নির্য্যাতিতা মাতার কথা বলিতোছল,—ভীষণ অন্নসমস্যার কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল,—তখন অনিন্দিতার দুইচক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছিল।—তার পর কিশোর যখন তাহার পিতার শোচনীয় মৃত্যুর কথা, শ্মশানের শেষ দৃশ্যের কথা বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন অনিন্দিতা আর স্থির থাকিতে পারল না;—সে উঠিয়া কিশোরের নিকটে আসিয়া তাহার হাতের উপর আপনার কোমল কর পল্লব স্থাপন করিয়া, অতি করুণ স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—

"কিশোর বাবু, আপনি সত্যই দুঃখী ; সমাজ সংসার, এমন কি স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত, আপনার উপর অত্যাচার করেছেন। আমি ভাবছি, এই কি বিধাতার বিধান—সমাজের ব্যবস্থা ? দরিদ্র যে, দুর্ব্বল যে, অসহায় যে,—তাকেই দুঃখের চক্রনেমির তলে পিষে মরতে হবে, প্রবলের নির্ম্মম আঘাতে চূর্ণ হতে হবে ?—"

অনিন্দিতার স্পর্শে কিশোরের সর্ব্ব শরীরে একটা অননুভূতপূর্ব্ব পুলক শিহরিয়া উঠিল,—তাহার কথা শুনিতে শুনিতে কিশোরের মনে হইল যে, কোন স্বর্গীয় নির্ঝরিণী হইতে অমৃতধারা নামিয়া আসিতেছে, আর সে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া তাহাই পান করিতেছে। কিশোরের হৃদয় এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল,—যে প্রবল ঝটিকায় তাহার দুঃখের সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা শান্ত হইয়া, একটা বিষাদ মিশ্রিত স্নিগ্ধভাব তাহার স্থান অধিকার করিল।

কিশোর ও অনিন্দিতা যখন পরস্পরের অতি নিকটে দাঁড়াইয়া গভীর ভাবরাজ্যের মধ্যে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহারা জানিতে পারে নাই, কোন সময়ে নরেশ সেই কক্ষের মধ্যে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

(নরেশ দেখিতেছিল—কিশোর ও অনিন্দিতা—দুই প্রেমিক প্রেমিকা, তাহাদের মুখে চোখে কি একটা নূতন ভাবের দীপ্তি ; তাহারা পরস্পরের অতি নিকটে আসিয়া মিলিয়াছে ;—কিশোরের বাম হস্তের উপর অনিন্দিতার দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত, অনিন্দিতার অঞ্চলপ্রান্ত কিশোরের অঙ্গে যাইয়া লাগিয়াছে, তাহার এলায়িত দীর্ঘ কেশের দুই একটী গুচ্ছ বাতাসে উড়িয়া কিশোরের বাহুমূল স্পর্শ করিতেছে। নরেশের মনে হইল, তাহাদের দুই জনের নিঃশ্বাসের মৃদু কম্পনও যেন তাহারা পরস্পরে অনুভব করিতেছে।)

নরেশের বুকে যেন বৃশ্চিক দংশন করিল, তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা আগুনের হল্‌কা ছুটিয়া গেল। এ কি—যে সন্দেহ এত দিন ধরিয়া তাহার মনে জাগিতেছিল, তাহাই কি সত্য হইল? যে আশঙ্কায় সে দিবারাত্রি শান্তি অনুভব করিতে পারে নাই, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ কি সে নিজের চোখেই দেখিল? কিশোর ও অনিন্দিতা উভয়েরই উপর, নরেশের একটা বিজাতীয় ক্রোধ হইল,—কিন্তু বিশেষভাবে কিশোরকেই সে এই 'অপরাধের' জন্য দায়ী করিল।

নরেশ তীব্র কণ্ঠে ডাকিল—"কিশোর?"

কিশোর ও অনিন্দিতা উভয়েই চমকিয়া ফিরিল এবং নরেশকে দেখিয়া কতকটা বিস্মিত হইল। অনিন্দিতা দেখিল, নরেশের মুখে একটা অস্বাভাবিক বৈবর্ণ্য, চোখে পৈশাচিক দীপ্তি, অধরে ক্রূর হাসির রেখা। অনিন্দিতার হৃদয় কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল, সে নরেশের দিকে চাহিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—

"আসুন নরেশবাবু, দাদাকে খুঁজছেন বুঝি?"

নরেশ কোন উত্তর দিল না, কেবল তীব্র দৃষ্টিতে কিশোর ও অনিন্দিতার দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টির সম্মুখে কিশোর অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

---

## ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মোহিত সকাল বেলা বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় করুণাময় বাবুর ভৃত্য লক্ষ্মণ বেহারা আসিয়া তাহার হাতে এক-খানি পত্র দিল। মোহিত পত্র খুলিয়া দেখিল, প্রতিমার মা লিখিয়াছেন ;—

"বাবা মোহিত, তুমি আজ অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করবে। ইতি জেঠাই মা।"

মোহিত পত্র পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পত্র খানির মধ্যে বিশেষ কোন কথা ছিল না বটে, কিন্তু মোহিতকে কেহ যদি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে বলিত, তবে এর চেয়ে তার পক্ষে সহজ কাজ হইত। আজ এত দিন পরে, আবার প্রতিমাদের বাড়ী! সেই ভীষণ রাত্রির স্মৃতি—ভূত-ভয়গ্রস্ত ব্যক্তির মতো প্রতিমার সেই ভীতি ব্যাকুল দৃষ্টি মোহিত আজও ভুলিতে পারে নাই, তাহার হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইয়া আছে। প্রতিমা নিশ্চয়ই তাহাকে চিনিয়াছিল! না জানি, সে তাহাকে কত বড় হৃদয়হীন, অকৃতজ্ঞ, দস্যু মনে করিয়াছে! আজ কোন মুখে আবার সে প্রতিমার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইবে? স্পষ্ট দিবালোকে সেই বিশাল আয়ত নেত্রের সরল দৃষ্টির দিকে চাহিবে? তার পর প্রতিমা কি তাহার বাবা ও মাকে সব কথা বলিয়াছে? খুব সম্ভব বলে নাই! কিন্তু যদি বলিয়া থাকে,—উঃ, কি ভয়ঙ্কর অবস্থাই না তাহার হইবে! না—সে প্রতিমাদের বাড়ী যাইবে না—যাইতে পারিবে না!

কিন্তু জেঠাইমার বিশেষ অনুরোধ, তাহাই বা সে উপেক্ষা করিবে কিরূপে? সে যদি না যায়, তবে প্রতিমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইবে। আর তাহার না যাইবারই বা কৈফিয়ৎ কি আছে?

জেঠাইমা হয়ত প্রতিমার বিবাহের কথা বলিবার জন্য ডাকিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ার সুবোধের সঙ্গে প্রতিমার বিবাহের প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রতিমার নিজেরই অসম্মতিতে। জেঠাইমা কি তাহাকে বলিবেন, প্রতিমাকে বুঝাইয়া সম্মত করিতে ? কিন্তু প্রতিমা তাহার কথা শুনিবে কেন ? তার বাবা—মার কথা, অনিন্দিতার কথা সে শোনে নাই, আর মোহিতের কথা শুনিবে, তার কি কোন সম্ভাবনা আছে ? কিন্তু—।

মোহিত বিষম চিন্তায় পড়িল, তাহার মন ঘূর্ণব্যাতায় পতিত বৃক্ষ পত্রের ন্যায় চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কোথাও সীমা দেখিতে পাইল না। কিন্তু তাহার জীবনের একটা প্রধান কর্ত্তব্য প্রতিমাকে সুখী করা। ইঞ্জিনিয়ার সুবোধের সঙ্গে বিবাহ হইলে, প্রতিমা সুখীই হইবে—এমন ছেলে আজকাল সহজে মিলে না। আর প্রতিমা যদি মোহিতের কথা কিছুমাত্রও মনে স্থান দিয়া থাকে,—যদি সেই জন্যই—। সহসা বিদ্যুৎ বিকাশের মত অনিন্দিতার কথা মোহিতের মনে পড়িয়া গেল,—'পুরুষ জাতি চোখ থাকিতে অন্ধ'! তাহার মনে একটা গভীর সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই জোর করিয়া সে ভাবিল—না—না, কখনই তাহা হইতে পারে না, তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে যে কথা লুকাইয়া আছে, প্রতিমা তাহার সন্ধান পাইবে কিরূপে ? এ জগতে কেহই তাহা জানে না, কোন দিনই জানিতে পারিবে না,—যক্ষের অমূল্য ধনের মতো সে মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত তাহা লুকাইয়া রাখিবে। আর ঠিক এই কারণেই প্রতিমার সম্বন্ধে তাহার একটা কঠোর দায়িত্ব আছে। তাহাকে এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবেই। যতই অগ্নি পরীক্ষা দিতে হোক, তাহা সে সহ্য করিবে; যদি নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়, জীবনের সমস্ত আশা ও আনন্দকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবু সে পশ্চাৎপদ হইতে পারিবে না।

মোহিত আপনার মনে হাসিল,—যে কোন দিন, গুপ্ত শত্রুর সহসা

নিক্ষিপ্ত ছুরিকা,—ললাটের সম্মুখে উদ্যত রিভলভার দেখিয়া ভয় পায় নাই, আজ সে একজন তরুণীর তীক্ষ্ন দৃষ্টির ভয়ে ভীত!

( ২ )

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। প্রতিমা তাহার পড়িবার ঘরের মেজেতে ভূমি শয্যায় শুইয়া আছে। ঘরে আলো নাই, ইচ্ছা করিয়াই সে আলো জ্বালে নাই। বৈদ্যুতিক আলোর তীব্রতা সে সকল সময়ে সহ্য করিতে পারিত না, তাহার মনের গভীর চিন্তাসূত্র, ধ্যানযোগ যেন তাহাতে ছিন্ন হইয়া যাইত। তাই আজ কাল সে অনেক সময় অন্ধকারেই থাকিত, অন্ধকারের নির্জ্জনতার মধ্যেই কতকটা মনের শান্তি লাভ করিত।

প্রতিমা সেই ভীষণ দুর্য্যোগ রজনীর ঘটনা বিন্দুমাত্রও ভুলিতে পারে নাই, তাহার মনে আগুনের অক্ষরে উহা লেখা রহিয়াছে। মোহিত দা—মোহিত দা—কে তবে? সে কথা ভাবিতেও প্রতিমার বুক কাঁপিয়া উঠিত।

প্রতিমা শুনিয়াছে যে, বিপ্লববাদী যুবকেরা দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য এই রকম সব দুঃসাহসিক কাজ করে। কিন্তু দেশকে কি অন্যভাবে ভালবাসা যায় না, স্বাধীনতা লাভের কি অন্য কোন পন্থা নাই? অনিন্দিতা তার দাদার জীবনের এ সব কথা বোধ হয় জানে না। জানিলে সে কি মনে করিত?

প্রতিমা গভীর ভাবনা সমুদ্রে নিমগ্ন হইল, ভাবিয়া সে কোন কুল-কিনারা পাইল না, তাহার মন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া আসিল। সে যেন তন্দ্রা-ঘোরে শুনিল—মোহিত তাহার নিকট আসিয়া বলিতেছে—"ছি, প্রতিমা, তুমি এত দুর্ব্বল, বাঙ্গালীর মেয়েরা এমন হয়, এ আমি চাই না।"

প্রতিমা চমকিয়া উঠিল, তাহার তন্দ্রার ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, পরক্ষণেই সে শুনিল—বাহিরে দাঁড়াইয়া কে ডাকিতেছে—"প্রতিমা-প্রতিমা"!

এ যে মোহিতেরই গলার স্বর! প্রতিমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ টিপিয়া দিল, ঘর তীব্র আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। মোহিত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"এ কি প্রতিমা, তুমি এমন অন্ধকারে বসেছিলে কেন?"

প্রতিমা মোহিতের দিকে একবার চাহিয়াই চক্ষু নত করিল। তাহার মুখ রক্তশূন্য হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া আসিল। ইনিই কি সেই মোহিত-দা, সেই সর্ব্বনেশে ঝড় জলের রাত্রে—ইনিই কি?—

কিন্তু এযে প্রশান্ত মূর্ত্তি, ললাটে একটী রেখা নাই, সেই—হাস্যময় প্রফুল্ল মুখ, স্নেহময় নয়নযুগল! এ লোকের দ্বারা গভীর নিশীথের সেই দস্যুবৃত্তি কি সম্ভব হইতে পারে? যদি তাহাই হইত, তবে আজ কিরূপে এমন নিঃসঙ্কোচ ভাবে আমার সম্মুখে আসিয়াছেন? অপরাধী কি এমন প্রশান্ত নির্ভীক হইতে পারে? প্রতিমার মনে সংশয়ের উদয় হইল। নিজের ইন্দ্রিয় কি তবে তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে?—

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রতিমার মনে বিদ্যুতপ্রবাহের মত এই সব ভাব বহিয়া গেল; দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া সে মোহিতকে অভ্যর্থনা করিবার মত একটা কথাও বলিতে পারিল না।

প্রতিমার এই ভাবান্তর মোহিতের দৃষ্টি এড়াইল না। সে তাহার অবনত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমার কি কোন অসুখ করেছে, প্রতিমা। শরীর বড় কাহিল হয়ে গিয়েছে, দেখছি। অনি বলছিল—"

প্রতিমা জোর করিয়া মুখে প্রফুল্লতা আনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা কেবল একটা ম্লান হাসির রেখার মধ্যে মিলাইয়া গেল।

তবু কোনমতে আপনাকে সংযত করিয়া সে বলিল—"কোন অসুখ হয়নি, মোহিতদা! অনির কথা শোন কেন, সে তিলকে তাল করে তোলে। তুমিই বরং রোগা হয়ে গিয়েছ। অনেকদিন তোমাকে দেখিনি,

ভুলেও একটীবার এদিকে আস না। আমার সময় সময় তোমার উপর এমন রাগ হয়—!”

মোহিত কোন উত্তর দিল না, সে একদৃষ্টে প্রতিমাকে দেখিতে লাগিল। প্রতিমার মধ্যে আজ সে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। প্রতিমার ঈষৎ বিষাদম্লান মুখশ্রী, ব্রীড়া সঙ্কুচিত দৃষ্টি, আবেগ কম্পিত কণ্ঠস্বর ;— এ যেন সে তাহার আকৈশোর পরিচিত প্রতিমা নয়। কিশোরীর চাপল্য, আনন্দ-উচ্ছ্বসিত তরল লঘুভাব, ইহার মধ্যে নাই! এ তরুণী যেন জীবনকে গভীরভাবে দেখিতে শিখিয়াছে, কি একটা অব্যক্ত বেদনা তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে রেখাপাত করিয়াছে,—তাহার প্রাণ স্রোতের অবাধ গতিতে কোথায় যেন একটা বাধা পড়িয়াছে ;—সে যেন আজ কী বলিতে চায়, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে না, অথবা বলিবার ভাষা খুজিয়া পাইতেছে না। তবু তরুণীর হৃদয়ের সেই অব্যক্ত ভাবের তরঙ্গ আসিয়া মোহিতের প্রাণে আঘাত করিল ; হর্ষবিষাদ মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মোহিতের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

মোহিতকে নীরব দেখিয়া প্রতিমা অভিমানের সুরে বলিল—“আমার কথা তুমি বুঝি শুনতে পাওনি মোহিতদা!”

মোহিতের যেন চমক ভাঙ্গিল ; সে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া বলিল— “শুনেছি বই কি প্রতিমা। আমার অপরাধ আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করছি। কিন্তু কেন আসিনি, তা সত্যই শুনতে চাও, প্রতিমা?”

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে মোহিতের মুখের গম্ভীর ভাব দেখিয়া প্রতিমা উদ্বিগ্ন হইল। সে দৃষ্টি অবনত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—

“যদি বলতে বাধা থাকে, তবে বলে কাজ নেই—”

মোহিত কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। তাহার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল,—সে হাসি যেন গভীর দুঃখেরই

রূপান্তর;—অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মির মতোই তাহা করুণ। সহসা প্রতিমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মোহিত বলিল—

"আমি যদি ডাকাত হতেম, তা হলে কি তুমি আমাকে ঘৃণা করতে প্রতিমা ?"

প্রতিমা নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন থামিয়া আসিল। মোহিতদা কি তবে স্বীকার করিতে চান যে, তিনি ডাকাত ? যদি আরও কিছু বলিয়া বসেন ? মোহিতকে বাধা দিবার জন্যই যেন প্রতিমা ব্যস্তভাবে কহিল—"আমি তোমাকে ঘৃণা করবো মোহিতদা, এটা তুমি কল্পনা করতে পার ?"—প্রতিমার কণ্ঠস্বর ক্ষোভে· দুঃখে রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মোহিত ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলিল—

"চোর ডাকাতদের তো ঘৃণাই করতে হয়, প্রতিমা। তারা তো ভাল লোক নয়, তারা সমাজের শত্রু—"

প্রতিমা অবাক হইয়া মোহিতের দিকে চাহিয়া রহিল। মোহিতের অধরে আজ একি প্রহেলিকাময় হাসি ? তিনি কি তবে প্রতিমার অন্তরের সংশয়-সন্দেহ জানিতে পারিয়াছেন ? প্রতিমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে—অতি ধীরে সে বলিল—

"মোহিতদা, তুমি কী, আমি জানতে চাই না। তুমি যা-ই হও না কেন, আমার দেবতা ; পূজারী কি কখনো দেবতার উপর শ্রদ্ধা হারাতে পারে ?"

মোহিতের হাসি মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল, তাহার মুখ গভীর বিষাদের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল। সে যেন প্রতিমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আজ স্বচ্ছ দর্পণে দেখিতে পাইল। ছি—ছি, সে এ কি করিতেছে ? তাহার দুঃখময় অভিশপ্তজীবনের বিষাক্ত ছায়ায় এই সরলা কিশোরীর জীবনকে

দূষিত করিয়া তুলিবার কি অধিকার তাহার আছে? না,—জেঠাইমার অনুরোধই তাহাকে রাখিতে হইবে, তা সে যতই কঠিন হোক,—তাহার দুর্ব্বল হৃদয় সেই প্রবল আঘাতে যতই অবসন্ন হইয়া পড়ুক!

মোহিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া যথাসাধ্য শান্ত সহজ স্বরে বলিল—

"প্রতিমা, আমি একজন লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে দলের লোক, দেবতা টেবতা কিছুই নই। জীবনে মানুষ অনেক ভুল করে বসে; কিন্তু সে ভুল সংশোধনের সুযোগ যদি আসে, তবে তা ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমি চাই না, আমার মত ভবঘুরে লোকের কথা ভেবে তুমি মনে কষ্ট পাও। বরং আমার ইচ্ছা তুমি আমাকে ভুলে যাও।—

তার পর কিছুক্ষণ নীরব হইয়া থাকিয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "শুনছিলাম ইঞ্জিনিয়ার সুবোধকে তুমি—"

প্রতিমা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল, কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। অবশেষে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—

"মোহিতদা, তুমিও যে এত নিষ্ঠুর হবে, তা আমি ভাবতে পারিনি। আমাকে একটু শান্তিতে থাক্‌তে দাও, আমি কারুর কথা ভাবতে চাইনে। কিন্তু মেয়ে বলেই কি আমার কোন স্বতন্ত্র সত্ত্বা নেই?—ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কোন জিনিষ নেই?"

মোহিত অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার একটা বিষম দুর্ব্বলতা ছিল যে, সে নারীর কাতরতা, অশ্রুজল সহ্য করিতে পারিত না। সে যে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছি, তাহা বুঝি আর রক্ষা করিতে পারিল না! না,— জীবনের এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় আজ তাহাকে পার হইতেই হইবে। প্রতিমাকে তাহারই মঙ্গলের জন্য যদি আঘাত করিতে হয়, উপায় কি? মোহিত কতকটা অনুযোগ—কতকটা আদরের সুরে বলিল—

"প্রতিমা, হয়ত তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে

মানুষ, কোথায় কখন যাই, তার ঠিক নেই। আমার উপর রাগ করোনা। বল, আমাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করবে? জেঠামশাই, জেঠাইমার মনে তুমি আঘাত দিও না, তাঁদের বড় স্নেহের কন্যা তুমি!"

প্রতিমা অপলক দৃষ্টিতে মোহিতের দিকে চাহিয়া রহিল—যেন পাষাণে গঠিত মূর্ত্তি,—প্রাণহীন, নিশ্চল, কেবল ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। সে নিশ্চল পাষাণ প্রতিমা দেখিয়া মোহিত শঙ্কিত হইয়া উঠিল, আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল—'প্রতিমা, প্রতিমা'!

প্রতিমা যেন দূরে—অতিদূরে আর এক জগতে প্রস্থান করিয়াছিল, মোহিতের ব্যাকুল আহ্বানে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিল।—ম্লান হাসিয়া সে বলিল—

"কাউকে কি ইচ্ছে করলেই ভোলা যায় মোহিত দা—মানুষের হৃদয় জিনিষটা কি এতই সহজ? মানুষের হৃদয়ের উপরেও যে তার সব সময়ে জোর থাকে না! যদি তোমার কথা নাই রাখতে পারি, তবে—"

তারপর সহসা পূর্ব্বের সেই চপলা কিশোরী প্রতিমার মতোই তরল মধুর হাসিয়া বলিল—

"তুমি একটু বস মোহিত-দা।—আজ আমার জন্মতিথির ঋণ শোধ করে যেতেই হবে তোমাকে!"—বলিয়া—কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হাসিতে হাসিতে সে বিদ্যুৎগতিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

প্রবল ঝটিকার অবসানে শ্রান্ত পথিকের মত মোহিত হতবুদ্ধি হইয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। সে বুঝিতে পারিল—এ যুদ্ধে সে-ই আজ পরাজিত—প্রতিমা বিজয়িনী!

---

## চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

মোহিতদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নরেশের মনের জ্বালা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। ঘরে আগুন লাগিলে রুদ্ধদ্বার গৃহ-মধ্যস্থ ব্যক্তি যেমন কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে থাকে, নরেশেরও ঠিক সেই অবস্থা হইল! সে সমস্ত দিন পথে পথে লক্ষ্যহীন ভাবে—পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু কি করিয়া যে কিশোরকে অনিন্দিতার সংস্রব হইতে দূর করিবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। মোহিতকে বলিবে? বলিয়া কোন ফল নাই। কিশোরের উপর মোহিতের অসীম আকর্ষণ। মোহিত তো এ কথা কানেই তুলিবে না, উপরন্তু—বন্ধু বিচ্ছেদ হইবে। তারপর মোহিত তাহাকে যখন প্রশ্ন করিবে—অনিন্দিতার জন্য তাহার এত মাথাব্যথা কেন, তখন সে কি উত্তর দিবে? নরেশ মনের ভিতর সহসা কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

কেন, তাহার কি অনিন্দিতার উপর কোন দাবী, কোন অধিকার নাই? সে কি এতই পর? ওই কুলীর অধম মূর্খ, ভিক্ষুক, কিশোর অনিন্দিতার সঙ্গে অবাধে মিশিবার সমস্ত অধিকার ভোগ করিবে, আর নরেশই কেবল নিতান্ত বাহিরের লোকের মতো উপেক্ষিত—অবজ্ঞাত হইয়া থাকিবে? এর চেয়ে ঘোর অন্যায় কি হইতে পারে? সে মোহিতের বন্ধু—অনিন্দিতার যথার্থ মঙ্গলকামী, অনিন্দিতার যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহা করিবার অধিকার অবশ্যই তাহার আছে। বরং যদি সে অনিন্দিতাকে এই আসন্ন-বিপদ হইতে রক্ষা না করে, তবে তাহার মনুষ্যত্ব—পৌরুষ রহিল কোথায়? পুরুষের ধর্ম্মই নারীকে রক্ষা করা। ভয়ে বা মোহে নিবৃত্ত হইলে তাহার পক্ষে চরম কাপুরুষতা হইবে।

অনিন্দিতা হয়ত বুঝিতে পারিতেছে না যে, সে নিজের অজ্ঞাতসারে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া নিজেরই বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে। অনিন্দিতা কি কিশোরকে সত্যই ভালবাসে? কি গুণে কিশোর তাহার মন আকর্ষণ করিল? না—না—সে অসম্ভব! কিশোরকে দরিদ্র ও আশ্রিত দেখিয়া তাহার প্রতি অনিন্দিতার মনে করুণা জাগিয়াছে, কিশোরের দুঃখে তাহার কোমল নারী হৃদয় বিচলিত হইয়াছে। কিন্তু মূর্খ কিশোর তাহা বুঝিতে পারে নাই, সে হয়ত এই করুণাকেই ভালবাসার চিহ্ন মনে করিয়া আত্মহারা হইয়াছে। কি আস্পর্দ্ধা! মূর্খ কুলীর বুদ্ধি আর এর বেশী কি হইতে পারে? অনিন্দিতার এই দয়ার সুযোগ লইয়া কিশোর যে অধিকতর দুঃসাহসী হইয়া উঠিবে না, তাহা কে বলিতে পারে!

অনিন্দিতা কি নরেশকে ভালবাসে? প্রথম যেদিন অনিন্দিতার সঙ্গে নরেশের শুভমুহূর্ত্তে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেইদিন হইতে সমস্ত ঘটনা মনে মনে আলোচনা করিয়া নরেশ দেখিল, অনিন্দিতা কোনদিন সুস্পষ্ট-ভাবে তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই বটে, কিন্তু তাহাকে অনিন্দিতা যে খুবই শ্রদ্ধা করে, তাহাতে সন্দেহ নাই;—শুধু শুষ্ক শ্রদ্ধা নয়, বোধ হয়—মনের গোপন কোণে একটু ভালবাসাও আছে! তাহার ঈষৎ লাজ-নম্র দৃষ্টি, অধরে মেঘ-ভাঙ্গা জ্যোৎস্নার মতো, নির্ম্মল হাসির-রেখা, ইহার মধ্যে কি কোন গভীর রহস্য লুক্কায়িত নাই? নরেশ গেলে অনিন্দিতা যে ভাবে তাহার সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হয়,—সে কি কেবল অতিথি-সৎকার! কখনই নয়,—তাহার মন বলিতেছে, অনিন্দিতা সত্যই তাহাকে ভালবাসে।

কিন্তু অনিন্দিতার ভালবাসা লইয়া নরেশ কি করিবে? সে তো দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগী,—সর্ব্বস্ব—প্রাণ পর্য্যন্ত দেশের নিকট সে উৎসর্গ করিয়াছে,—যদি সম্ভব হয়, তার চেয়েও বেশী দিবার জন্য প্রস্তুত! তাহার

জীবন তো সন্ন্যাসীরই জীবন,—সন্ন্যাসীর নারী-প্রেমে কি প্রয়োজন? অনিন্দিতার প্রেম গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

অনিন্দিতার প্রেম সে গ্রহণ করিতে চায় না, দূর হইতে ভালবাসিয়াই সে সুখী হইবে। কিন্তু অপাত্রে পড়িয়া সেই স্বর্গীয় প্রেম অপমানিত হইবে, এ সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। অনিন্দিতা যোগ্য ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া সুখী হোক, তাই নরেশের একান্ত কামনা। নরেশ নিজে নিষ্কাম, সর্ব্বত্যাগী—সন্ন্যাসী, কেবলমাত্র অনিন্দিতার মঙ্গলের জন্যই সে ব্যগ্র। গীতায় ভগবান কর্ম্ম-সন্ন্যাসীর যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে কেবলমাত্র সেইটুকু করিতেছে। নিজের মহান্ আদর্শ কল্পনা করিয়া, আচার্য্যের নিকট গীতা পাঠ সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া, নরেশ মনে মনে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল।

অতএব যেরূপেই হোক, কিশোরকে সরাইয়া অনিন্দিতার পথের কণ্টক দূর করিতে হইবে। 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম'—এতো প্রাচীন ভারতেরই রাজনীতির কথা। অন্যায়? হয় ত বাহ্যতঃ লোকচক্ষে একটু অন্যায় বোধ হইতে পারে। কিন্তু যেখানে মহত্তর কর্ত্তব্য সম্মুখে, সেখানে ছোট খাট অন্যায় কিছুই নহে। ইহাই বৃহত্তর ধর্ম্ম।

নরেশের মনে এই ভাব-সংগ্রাম চলিয়াছে, আর সে লক্ষ্যহীন ভাবে পথ চলিতেছে। কখন যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। এক সময়ে সে গলির মোড়ে চাহিয়া দেখিল, রোহিণীবাবুর বাড়ী, কয়েকদিন পূর্ব্বে গভীর রাত্রে একদিন যেখানে সে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার মন কি তাহাকে তাহার অজ্ঞাতসারেই সেখানে লইয়া আসিয়াছে?

এ নিশ্চয়ই বিধাতার ইঙ্গিত। 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'। একদিন যে ঘৃণিত প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, আজ বৃহত্তর প্রয়োজন

সাধনের জন্য সে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? তুচ্ছ একজন ভিক্ষুক কুলী যদি কালাপানি যায় বা কারাগারে পচে, তাহাতে কাহার কি আসে যায়? একটা অমূল্য জীবন, ধরণীর একটী শ্রেষ্ঠ সম্পদ—তাহার ফলে রাহুগ্রাসমুক্ত হইয়া অকলঙ্ক নির্ম্মল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইবে।

দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা! কথনই নয়! বরং ইহাতে অনেক গুপ্তরহস্য চাপা পড়িয়া যাইবে, গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভুল-পথে চালিত হইবে। একটা ক্ষুদ্র ডিপ্লোমেসি বা কৌশলের বিনিময়ে দেশের মহান্ কল্যাণ হইবে।

এই—ই—ঠিক—'ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ'!

*　　*　　*　　*

কিছুক্ষণ পরেই রোহিণী বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নরেশ বলিল,—"রোহিণীবাবু ভেবে দেখলাম, আপনার প্রস্তাবটা একেবারে তুচ্ছ করবার মতো নয়। তাই আপনার সঙ্গে সেটা বিশেষভাবে আলোচনার জন্যই এসেছি।"

রোহিণীবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার নরেশের দিকে চাহিলেন,—তাঁহার মুখ এক রহস্যময় হাসিতে ভরিয়া উঠিল। তিনি আনন্দে নরেশের কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন—

"এই তো চাই বাবা! ভগবান এতদিনে তোমার জ্ঞানচক্ষু একটু খুলে দিয়েছেন। এখন বুঝবে, আমি তোমার যথার্থ বন্ধু কি না!"—

রোহিণীবাবু চাপা-গলায় হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

---

## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

মোহিত অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতেছিল। তাহার হৃদয়ে যে প্রবল ঝটিকা উঠিয়াছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণ শান্ত হয় নাই। কলিকাতার রাস্তার সেই জনতা,—গাড়ী ঘোড়া, ট্রাম মোটর ছুটাছুটি করিতেছে, মোহিতের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। কখন যে সে মাণিকতলার মোড় ছাড়িয়া একটা সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গলিতে প্রবেশ করিল, তাহা সে ভাল করিয়া লক্ষ্যও করিল না। সে অন্ধকারের রাজ্যে আলোর সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নাই। গলির মোড়ে যে বাতিটা মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, তাহাতে অন্ধকার দূর করে নাই, বরং সমস্ত স্থানটা আরও অজ্ঞাত রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। গলির দুই পার্শ্বে, কোন কোন স্থলে, উপরে সবুজ রং এর কর্দ্দমমিশ্রিত জল জমিয়া রহিয়াছে,—কত দিন হইল যে জমিয়া আছে, তাহা স্বয়ং বিধাতাও বোধ হয় বলিতে পারেন না। সমস্ত স্থানটা হইতে এমন একটা পচা দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, যাহাতে অনভ্যস্ত আগন্তুকের অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত পাকস্থলী হইতে উঠিয়া আসিতে চায়। মোহিত অতি কষ্টে নাকে কাপড় দিয়া সেই পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত বড় গলিটির দুই পার্শ্বে ছোট ছোট গলি বা সরু রন্ধ্র, তাহার দুই ধারে অগণ্য খোলার ঘর। সেখানে চোর, গাঁটকাটা, পেশাদার ভিক্ষুক হইতে আরম্ভ করিয়া,—রিক্সওয়ালা, কুলপী বরফ ওয়ালা, ভুনিওয়ালা, গাড়োয়ান, ঝাঁকামুটে,—সব রকম লোকের আড্ডা। অন্ধকারের মধ্যে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলে বুঝা যায়, এই সমস্ত খোলার ঘরের সম্মুখে, কোথাও বা বড় গলির ধারে, দুই একটা নারীমূর্ত্তি বা প্রেতমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। লোকে বলিবে

ইহারা শিকার ধরিবার জন্য 'ওৎ' পাতিয়া আছে। কিন্তু ইহাদের অবসাদক্লান্ত কোটরগত চক্ষু, অনাহার ক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ, চোয়াল বসা শ্রীহীন মুখ দেখিলে—কী মর্ম্মান্তিক যাতনায় যে ইহারা দেহখানা সাজাইয়া গুছাইয়া কোন রকমে বাহিরে আনিয়া খাড়া করিয়াছে, তাহা কল্পনা করিতেও অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে। এই ক্লান্ত, অনাহার শীর্ণ, যন্ত্রণাদগ্ধ দেহখানাকে, লালসার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যাহারা আলিঙ্গন করিতে পারে, তাহারা কি সহজ ও স্বাভাবিক মানুষ?

এক জায়গায় কয়েকজন উড়ে বেহারা রাস্তায় বসিয়া তাস খেলিতেছিল। একটী ৪০।৪২ বৎসর বয়স্কা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক, মুখে বসন্তের দাগ,—তাহাদের নিকটে আসিয়া মিনতি কাতর কণ্ঠে বলিল—"দে-না বাবা, একটা পুরুষ-মানুষ ডেকে, আজ দুদিন খাই নি।'

উড়ে বেহারারা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল—

"চার গণ্ডা পয়সা তো পাবি, তার অর্দ্ধেক বখরা যদি আমাকে দিস, তবে না হয় চেষ্টা দেখি—"

স্ত্রীলোকটী কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল—"তুই বড় বেশী বল্‌ছিস্!"

মোহিত চলিতে চলিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। কথাগুলি যেন তপ্ত শেলের মতো তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিল। পকেট হাতড়াইয়া দেখিল, একটী মাত্র টাকা তাহার নিকটে আছে। মোহিত স্ত্রীলোকটীর দিকে অগ্রসর হইতেই, স্ত্রীলোকটী একবার সন্দিগ্ধভাবে তাহার দিকে চাহিয়াই সভয়ে কয়েক পদ পিছাইয়া গেল। মোহিত তাহার আরও নিকটে গিয়া কোমল কণ্ঠে বলিল—

"ভয় নেই মা, এই টাকা নিয়ে খাবার জিনিষ কেন গে, আজ আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।"

স্ত্রীলোকটী তবু দ্বিধা করিতেছিল। মোহিত তাহার হাতে টাকাটা

গুঁজিয়া দিয়া বলিল—"যাও, নইলে এইখানেই আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।"

স্ত্রীলোকটীর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কি একটা কথা সে বলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না, বোধহয় ভাষা খুজিয়া পাইল না। তার পর মোহিতের দিকে চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে একটা সরু রন্ধ্রের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মোহিত একটা দীর্ঘনিংশ্বাস ফেলিয়া আবার চলিতে লাগিল। এবার সে একটা সরু রন্ধ্রপথের মোড়ে দাঁড়াইয়া চারিদিকে অতি সাবধানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। তার পর একটা খোলার ঘরের সম্মুখে গিয়া দরজায় মৃদু করাঘাত.করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরেই একটা ক্ষীণ আলোক রশ্মি দেখা গেল এবং গৃহের দ্বার ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উন্মুক্ত হইল।

---

## ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

মোহিত একটা ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে গভীর চিন্তামগ্নভাবে পাদচারণা করিতেছে। তাহার দুই হস্ত পশ্চাতে নিবদ্ধ, ললাটে উদ্বেগের রেখা। চক্ষুর দৃষ্টি দেখিলে মনে হয়, যেন সে দৃষ্টি নিকটবর্ত্তী কোন বস্তু দেখিতেছে না, সুদূর ভবিষ্যতের এক অনাগত দৃশ্যের মধ্যে তাহা ডুবিয়া গিয়াছে। অদূরে মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া। সেও চিন্তামগ্ন, মাঝে মাঝে উদ্বিগ্নভাবে মোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

"—তুমি সুরেশের মা ও বালিকা বধূকে দেখে এলে, মহেন্দ্র—আমি তাদের কথাই কয়দিন থেকে ভাব্‌ছি।"

"হ্যাঁ, দেখে এলাম। সে যে কী হৃদয়বিদারক দৃশ্য, তা আমি ভাষায় বর্ণনা ক'রে বুঝাতে পারবো না। পল্লীগ্রামে ৩।৪ খানি ছোট খড়ের ঘর, তাও সংস্কারের অভাবে মানুষের বাসের অযোগ্য। কাল বৈশাখীর আক্রমণে পূর্ব্বেই দুখানি ঘর ভূমিসাৎ হয়েছে, অন্য দুখানিও পতনোন্মুখ। চালে খড় নাই, রোদের উত্তাপ, বর্ষার জল অবাধে সে ঘরে প্রবেশ করতে পারে। সুরেশের বুড়ো মা, বালিকা বধূটীকে নিয়ে অতি কষ্টে সেই আশ্রয়হীন গৃহে থাকেন। একমাত্র পুত্র সুরেশ আজ কারাগারে বন্দী, বুড়ো মা, বালিকা বধূকে এদের দেখবে? কোন দিন তাদের আহার জোটে, কোনদিন জোটে না। একে পতিপুত্রবিরহে তারা কাতর, তার পর অন্ন সমস্যা,—এ তো জীবন নয়, মৃত্যু—"

মোহিত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কেন প্রতিবাসী কেউ নেই?"

মহেন্দ্র যেন অতি দুঃখেও হাসিয়া বলিল—"আছে বৈকি! কিন্তু তারা

থেকেও নেই। এই অসহায়া দুইটী নারী, তাদের কাছ থেকে সাহায্য তো পায়ই না, বরং নিন্দা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা—প্রচুর পরিমাণেই লাভ করে থাকে।"

মোহিতের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সে মোহিতের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিল।

মহেন্দ্র একটু নীরব থাকিয়া বলিল—আমাকে দেখে বৃদ্ধা আমার হাত ধরে কেঁদে বললেন—"বাবা, সুরেশের ভাই ছিল না, তুমিই তার ভাই। বল বাবা, সে কি আর ফিরে আসবে না? আজ দু বছর সে বাড়ী ছাড়া। এর আগে মাঝে মাঝে চিঠি লিখে একটা সংবাদ দিত, কিন্তু আজ ৩।৪ মাস হল তাও বন্ধ করেছে। বাবা, সুরেশ আমার বেঁচে আছে তো? আমি বুড়ো মানুষ, বুকে পাষাণ বেঁধে কোন রকমে থাক্‌তে পারি, কিন্তু এই বালিকাকে কি বলে বোঝাই। সে যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে!"

আমি কোন উত্তর দিতে পারলেম না। কি উত্তর দেব? কেমন ক'রে সেই বৃদ্ধা মাতা ও বালিকা বধূকে বলবো যে, তোমাদের সুরেশ আজ কারাগারের অন্ধকক্ষে, কবে ফিরবে তা বিধাতাই জানেন; হয়ত আর ফিরে না-ও আসতে পারে! শুধু বল্‌লেম, ভয় কি মা, সুরেশ আবার আসবে, সে ভালই আছে।' এই কথায় বৃদ্ধার দুই গণ্ড বয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। আর সেই বালিকা—সে আমার সম্মুখে আসে নাই, কিন্তু দরজার আড়াল থেকে বলয়-কঙ্কণের অধীর শব্দ কাণে আসছিল, তাতেই তার হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা আমি যেন অনুভব করছিলাম। তপঃক্লিষ্টা নির্ব্বাসিতা সীতা, নলপরিত্যক্তা দময়ন্তীর কথা শুনেছি,—আমি যেন চোখের উপর দেখছিলাম সেই তপক্লিষ্টার রুক্ষকেশ, উপবাস ক্ষীণ অথচ জ্যোতির্ম্ময় দেহলতা। দ্বারের দিকে চেয়ে উদ্দেশে বললাম—'বৌ দিদি, সুরেশদাকে একদিন তোমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেব, এই আমি তোমাকে

কথা দিয়ে গেলাম। উত্তরে একটা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ও চাপা কান্না ছাড়া আর কিছু শুন্‌তে পেলাম না।"

মোহিত কোন কথা বলিল না, পূর্ব্বের মতোই পশ্চাৎদিকে দুই হস্ত নিবদ্ধ করিয়া কক্ষ মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র বলিল—"এই দারিদ্র্য, এই কষ্ট, এই যন্ত্রণা—এ তো আর দেখা যায় না। বল মোহিত দা, এই সব ভীষণ দুঃখের মূল্যে নিষ্ফল সাধনা করে লাভ কি?"

মহেন্দ্রের কথা শুনিয়া মোহিত স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তার পর মহেন্দ্রের মুখের উপরে জ্বলন্ত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল—

"এই সামান্য দারিদ্র্য ও অনাহারের যন্ত্রণা দেখে, নারীর অশ্রুজল দেখে তোমার মন ভেঙ্গে পড়েছে, মহেন্দ্র? কিন্তু এই তো সবে আরম্ভ,—এমন কত দারিদ্র্য ও অনাহারের দুঃখ, কত শোকাতুরা মাতা ও বিয়োগ বিধুরা পত্নীর অশ্রুজল দেখতে হবে! যদি এসব সহ্য করতে না পারি, তবে এ দুর্গম পথে যাবার অধিকারী আমরা নই। গরুড় অমৃত আহরণ রছিলেন, কিন্তু তার পূর্ব্বে তাঁকে ভীষণ অগ্নিলোক অতিক্রম করতে য়েছিল! মনে নাই কি, ভগবান গীতার প্রথমেই অর্জ্জুনকে এই মোহ, দয় দৌর্ব্বল্য—কার্পণ্য ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন?"

মোহিত কিছুক্ষণ নীরবে ভাবিতে লাগিল, তার পর মহেন্দ্রের দিকে াহিয়া বলিল—"কিন্তু শোন মহেন্দ্র, আজ তোমাকে একটা কথা বলি। রেশ ও তার সঙ্গীরা ধরা পড়লো কেমন করে জানো,—গুপ্তচর গৃহশত্রুর রোচনায়—"

মহেন্দ্র বিস্মিতভাবে মোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা কতে পারিল না।

মোহিত মৃদু হাসিয়া বলিল—"বিশ্বাস হচ্ছে না, বিশ্বাস করা কঠিন

বটে! কিন্তু জেনো, এর চেয়ে নিষ্ঠুর সত্যও আর কিছু নেই,—ইতিহাসে দেখ, চিরকাল এই হয়ে আসছে। আজ যারা আমাদের বন্ধু ও সহকর্ম্মী হয়ে, আমাদেরই সঙ্গে দুর্গম পথে জয় যাত্রা করে চলেছে ;—ভয়ে, মোহে, প্রলোভনে, এদেরই অনেক পিছিয়ে পড়বে,—এমন কি একদিন, তারাই হয়ত আমাদের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তাই হয়েছে। ঘরের লোকেরাই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান শত্রু। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মধ্যে এখনই ভাঙ্গন ধরতে সুরু হয়েছে—"

মহেন্দ্র নীরবে ভাবিতে লাগিল। মোহিত তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার কাঁধে হাত দিয়া সান্ত্বনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—"কিন্তু উপায় নেই, ভাই। এই দুর্গম পথের মাদকতায় অনেকে ছুটে আসবে বটে, আবার তাদেরই মধ্যে অনেকে পিছিল পথে, শিলার আঘাতে ধরাশায়ী হবে। তবুও তাদের ফেলেই চলতে হবে। যারা এই সর্ব্বনাশা ডাক শুনেছে, তারা কখনই ঘরে থাকতে পারবে না। মহেন্দ্র ভাই, এক একবার মনে হয়, আমরা নাগা সন্ন্যাসীর দল, আমাদের গৃহ নাই, পরিবার নাই, আত্মীয় স্বজন নাই,—সমস্ত বন্ধন কেটে ফেলে আমরা লক্ষ্যের পথে ছুটে চলেছি। জানি না, এ পথের শেষ কোথায়, কিন্তু তবু চলতে হবে। স্নেহ, দয়া, মায়া, ভোগ বিলাস, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য—এসব আমাদের জন্য নয়!"

মোহিতের মুখ এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃতে দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ দুই বন্ধুই নীরব হইয়া রহিল, যেন তাহারা কোন এক সুদূর জগতে চলিয়া গিয়াছে।

সেই নীরবতা ভাঙ্গিয়া মোহিতই প্রথমে বলিল—"অনেকদিন নরেশের দেখা নেই, সে কোথায় আছে বলতে পার?"

মহেন্দ্র ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিল—"কই আমিও তো কয়দিন তাকে দেখিনি।

কিছুদিন থেকে নরেশদার মধ্যে যেন একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। সে উৎসাহ নেই, যেন কি একটা সংশয়ের বেদনায় সে দুল্‌ছে।”

“আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি। শেষ যেদিন সে আমার কাছে গিয়েছিল, সেদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—‘বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য সামান্য কিছু অন্যায় করলে, সেটা কি পাপ বা বিশ্বাসঘাতকতা হয় ?”

আমি বলেছিলাম—“সকলক্ষেত্রে নয়। কিন্তু সাবধান ভাই, এই চোরাবালিতে পড়ে, অনেক মহাপ্রাণ বীর প্রাণ হারিয়েছে।”—

নরেশ কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তার মুখে যে একটা উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল, তা আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি।”

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল—“তোমার কি সন্দেহ হয়, নরেশ-দা শেষে চোরাবালিতে প্রাণ হারাবে ?”

মোহিত সে হাসিতে যোগ দিল না, গম্ভীর ভাবে বলিল—“যা আমরা বিশ্বাস করতে চাইনে, জগতে এমন ঘটনাও ঘটে থাকে।”

---

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

মোহিত যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু মোহিত দেখিল, তাহাদের গৃহ যেন নিঝুম নিস্তব্ধ, কোন জনপ্রাণী সেখানে আছে বলিয়া মনে হয় না। কোথাও একটা আলোর রেখা নাই, সমস্ত বাড়ীখানি ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন। অনিন্দিতা প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা নিজে সমস্ত আলো জ্বালিত, এ কাজটীতে কোন দিনই তাহার ভুল হইত না। সুতরাং গৃহ অন্ধকারময় দেখিয়া মোহিত যে কেবল বিস্মিত হইল তাহা নহে, তাহার মন আশঙ্কা ও উদ্বেগে পূর্ণ হইল। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় মোহিত দেখিল, ফটকটী খোলাই রহিয়াছে। বাহিরের বারান্দায় উঠিয়া মোহিত ডাকিল—"অনি—অনি—।"

কিন্তু কেহই সে ডাকে সাড়া দিল না। বাহিরের ঘরের দরজাও খোলা ছিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া মোহিত অন্ধকারেই অনুভব করিল যেন কি একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মোহিত বৈদ্যুতিক আলোর বোতাম টিপিয়া দিতেই, সেই আলোকোজ্জ্বল কক্ষে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া গেল। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র কে যেন ওলট পালোট করিয়াছে, সেগুলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে।—সর্ব্বত্রই একটা বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে, যেন অল্প কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দস্যুরা আসিয়া গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছে, অথবা কোন মাতালের দল সেখানে তাণ্ডবনৃত্য করিয়া গিয়াছে। দেয়ালে তাহার পিতার আমলের যে কয়েকখানা ছবি টাঙ্গানো ছিল, সেগুলাও টানিয়া নামানো হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে একখানি ছবি ভাঙ্গিয়া তাহার চূর্ণবিচূর্ণ কাচখণ্ড গুলি ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিশোর যে ঘরটাতে থাকিত, মোহিত

দেখিল, তাহার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়, সমস্ত জিনিষ ঘরময় ছড়ানো। কক্ষের একধারে খাটের উপরে যে বিছানাপত্র ছিল, সেগুলা কে যেন টানিয়া নামাইয়াছে এবং ছুরি দিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া চিরিয়াছে। তুলাগুলা গৃহের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মোহিত ভাবিল—"একি, বাড়ীতে কি পুলিশ হানা দিয়েছিল—তবে কি—?" মোহিত দ্রুতপদে অন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া আবার ডাকিল—"অনি"—। কোন উত্তর পাওয়া গেল না, কেবল একটা বেদনাময় দীর্ঘশ্বাস, চাপা কান্নার শব্দ যেন তাহার কাণে আসিল।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মোহিত দেখিল, অনিন্দিতা এককোণে ভূমিতে পড়িয়া আছে। তাহার দীর্ঘ কেশজাল বিশৃঙ্খলভাবে পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

মোহিত নিকটে যাইয়া স্নেহব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিল—"অনি" !—

অনিন্দিতা এবারেও কোন উত্তর দিল না, আরও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মোহিত তখন নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে অনিন্দিতার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—

"কি হয়েছে দিদি, আমি তো বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে !"

অনিন্দিতা উঠিয়া বসিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না।

মোহিতের মন নানা উদ্বেগ ও আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—"একটু স্থির হয়ে সব কথা খুলে বল্‌ দেখি। কিশোর কোথায়—সে কি এখনো ফেরেনি, বাড়ীতে কি পুলিশ এসেছিল ?"

অনিন্দিতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"হ্যাঁ, দাদা, তারা কিশোর বাবুকে হাতকড়ি দিয়ে চোর ডাকাতের মতো ধরে নিয়ে গেছে—"

মোহিতের হৃদয়ে কে যেন তপ্তশেল বিদ্ধ করিল, মুখ দিয়া একটী

কথাও বাহির হইল না। সে নিস্পন্দভাবে একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া বলিল—

"তারা সব বাড়ী খানাতলাসী কর্‌লে ?"

"হাঁ দাদা কোথাও কিছু বাকী রাখে নাই; বাহিরের বাগান থেকে আরম্ভ ক'রে—রান্নাঘর পর্য্যন্ত সমস্ত বিশৃঙ্খল লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। তুমি বাড়ী ছিলে না, আর কিশোর বাবু তো প্রথম থেকেই বন্দী;—আমরা দুই অসহায়া নারী—সে যে কী বিপদেই পড়েছিলাম, তা তোমাকে কেমন ক'রে বুঝাব? পাড়ার লোককে কাউকে যে ডাকবো, সে উপায়ও ছিল না, তারাও বোধ হয় লাল পাগড়ী দেখে ভয়ে এদিকে মাড়ায়নি।"

মোহিত অস্থিরভাবে কক্ষমধ্যে বেড়াইতে লাগিল: তাহার মুখে ক্রোধ, বিরক্তি ও উদ্বেগের সংমিশ্রণে যে ভাব ফুটিয়া উঠিল, অনিন্দিতা তাহা লক্ষ্য করিলে নিশ্চয়ই শঙ্কিত হইয়া উঠিত। কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিবার মতো মনের অবস্থা তাহার ছিল না।

মোহিত কিছুক্ষণ পরে বলিল—"তারা কি বল্‌লে ?"

"কিছুই বলেনি দাদা। কিশোর বাবুই একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন আমাকে গ্রেপ্তার কর্‌ছেন, আমি কি করেছি ?' সে কথার কেউ কোন জবাব দিল না, শুধু একজন বাঙ্গালী ইনস্পেক্টার বিদ্রূপ করিয়া বলিল—'রাজবাড়ীতে আপনার নিমন্ত্রণ হয়েছে কিনা, সেখানে জামাই আদরে থাকবেন—'।"

"আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছিনে দাদা, কিশোর বাবু কী অপরার করেছেন।"

"অপরাধের প্রয়োজন হয় না দিদি, ওদের সন্দেহই যথেষ্ট। হয়ত আমার কোন বন্ধুই এই পরম উপকার করেছেন!"

কি ভাবিয়া অনিন্দিতা চমকাইয়া উঠিল। তারপর মোহিতের নিকটে যাইয়া সংশয় কম্পিতকণ্ঠে বলিল—

“যখন খানাতলাসী হচ্ছিল, তখন একবার নরেশ বাবুকে দেখেছিলাম, দাদা। তিনি ওই মোড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়ীর দিকেই চেয়েছিলেন। আমি মনে করলুম তাঁকে ডাকি, কিন্তু আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই তিনি অকস্মাৎ চলে গেলেন, যেন খুবই লজ্জিত ও অপ্রস্তুতভাব। কেন দাদা, আমাদের এই বিপদে তিনি তো একবার এসে খোজ করতেও পারতেন!”

মোহিত অনিন্দিতার কথার কোন জবাব দিল না, বোধ হয় শেষ কয়টা কথা তাহার কাণে গিয়াছিল কিনা সন্দেহ। কোন গুপ্তঘাতক কাহারও বুকে ছুরিকাঘাত করিলে তাহার যে অবস্থা হয়, অনিন্দিতার কথার প্রথমাংশ শুনিয়াই মোহিতের সেইরূপ হইয়াছিল। সে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল, তাহার মুখ বেদনায় নীলবর্ণ হইয়া গেল।

অনিন্দিতা মোহিতের কাণের কাছে মুখ লইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিল—‘দাদা—দাদা’—

কোন উত্তর না পাইয়া অনিন্দিতা মনে করিল মোহিত নিশ্চয়ই মূর্চ্ছিত হইয়াছে, সে ব্যস্তসমস্ত ভাবে জল আনিবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

এমন সময় মোহিত অমানুষিক শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—“অনি,—কোন ভয় নাই, বোন। এদিকে আয়, শোন!”

অনিন্দিতা কম্পিতপদে মোহিতের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিল—মোহিতের মুখে পূর্ব্বেকার সে উদ্বেগ ও যন্ত্রণার

চিহ্ন আর নাই, তাহার স্থানে একটা প্রশান্ত দৃঢ়সঙ্কল্পের ভাব বিরাজ করিতেছে।

অনিন্দিতার মাথার উপরে এক হাত রাখিয়া অতি কোমল স্নেহপূর্ণ স্বরে সে বলিল—

"অনি, আমি চল্‌লেম। কোন চিন্তা করিস্‌নে, আমি কিশোরকে ফিরিয়ে আন্‌বোই।" বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। তারপর কি মনে করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে বলিল—

"অনি, আর যদি ফিরে না-ই আসি, সে আঘাত তোর ও মার বুকে বড়ই বাজ্‌বে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে, আমার বোন তুই, আঘাত যত প্রচণ্ডই হোক না কেন, তুই তা বুক পেতে নিতে পার্‌বি। একদিন তোকে আভাসে বলেছিলাম, আজ আবার স্পষ্ট করে বলি—তোর দাদা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, নিঃস্ব, রিক্ত,—দেশের জন্য তার ক্ষুদ্র জীবন হয়ত বলি পড়তে পারে। যদি সত্যই সেদিন আসে, তোর দাদার এই ব্যর্থ জীবন সার্থক হয়ে উঠ্‌বে। সেদিন আর চোখের জল নয়, বিজয়গর্ব্বের হাসিতে তোর মুখ যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—।"

মোহিত বিদ্যুৎগতিতে বাহির হইয়া গেল। অনিন্দিতা স্তম্ভিত—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল—'দাদা! দাদা!'

কিন্তু কোথায় সে? সেই রজনীর অন্ধকারে কোথায় সে মিশিয়া গিয়াছে!

---

## অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আজ একসপ্তাহ হইল মোহিত বা কিশোরের কোন সংবাদ নাই। অনিন্দিতার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে, তাহার মন উৎকণ্ঠার শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রত্যেক শব্দে, মনুষ্য পদক্ষেপে—সে চমকাইয়া উঠিতেছে ; মনে হইতেছে—বোধ হয় এইবার তাহারা আসিল। কিন্তু প্রতিবারেই তাগাকে নিরাশ হইতে হইতেছে। আষাঢ়ের প্রখর সূর্য্য প্রতি-দিনই উঠে, অস্ত যায়, আকাশে মেঘের খেলা পূর্ব্বের মতই চলে, রজনীর অন্ধকার সেই কাল রাত্রির মতোই তাহার গাঢ় মসীকৃষ্ণ কেশপাশে সমস্ত পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া আসে। কোন দিকেই তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই, মানুষের সুখদুঃখকে তাহারা চিরদিনই এমনি অবজ্ঞা করিয়া চলে। অনিন্দিতার নিকটে এই সাতদিন সাতবৎসরের মতোই সুদীর্ঘ হইয়া উঠিল। ইহার কি আর শেষ নাই ? এই সহরে তো এতলোক আছে, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনেরও তো অভাব নাই,—কিন্তু তাহারা তো কেহই আসিয়া ডাকিয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল না, এ বিপদে কোন আশা ভরসা দিল না! মানুষ কি এতই হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর ?—সমস্ত বিশ্বসংসারের উপর অনিন্দিতা বিষম বিরক্ত হইল।

কিশোরকে গ্রেপ্তার করতে দেখিয়া শ্যামমোহিনী মনে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। তারপব অনিন্দিতার মুখে তিনি যখন মোহিতের কথা শুনিলেন, তখন একেবারে শয্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ ওই সবই ভাবিতেন, কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেন না,—মাঝে মাঝে কেবল অনিন্দিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—

"বাহিরে, ও—কারা কথা বলছে, অনি ?"

অনিন্দিতা বিষণ্ণ ভাবে উত্তর দিত "কই, কেউতো নয় মা!"

অনিন্দিতার দুইচক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত। বৃদ্ধামাতার এই যন্ত্রণা আর যে সে সহ্য করিতে পারে না!

দাসী আসিয়া বলিল—"দিদিমণি, দাদাবাবুর বন্ধু একজন বাবু এসেছেন, আমি তাঁকে বাইরের ঘরে বস্‌তে বলে এলুম।"

শ্যামমোহিনী ধড় মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। অনিন্দিতা করুণ নেত্রে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি শোও মা, অত ব্যস্ত হয়ো না। আমি দেখে আসি, কে এসেছে।"

কিন্তু মাকে স্থির হইবার জন্য বলিলেও অনিন্দিতার নিজের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাহার বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল, বাহিরের ঘরের দিকে যাইতে পা আর উঠিতে চায় না। একি শঙ্কা, লজ্জা, উদ্বেগ, না, উৎকণ্ঠা?

"কে এসেছেন—কিশোর বাবু? তা তিনি একেবারে ভিতরে এলেন না কেন, তাঁর এত দ্বিধা সঙ্কোচ কিসের? আমরা যে তাঁর জন্য কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে আছি, তা কি তিনি বুঝতে পারেন না? এ তাঁর বড় অন্যায়! কিন্তু কিশোর বাবু একা এলেন কেন? দাদা সঙ্গে আসেন নি কেন? দাদা বলেছিলেন—কিশোরকে আমি ফিরিয়ে আনবো-ই। তবে কি তারা কিশোর বাবুকে ছেড়ে দাদাকেই ধরে রেখেছে?"—

এই সমস্ত কথা ভাবিতে ভাবিতে অনিন্দিতা এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, সে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া আগন্তুককে লক্ষ্য না করিয়াই ডাকিল—"কিশোর বাবু"!

কিন্তু পথ চলিতে চলিতে অকস্মাৎ সর্পদষ্ট পথিকের যে অবস্থা হয়, পরক্ষণেই অনিন্দিতার ঠিক তাহাই হইল। অনিন্দিতা কক্ষমধ্যে চাহিয়া সভয়ে দেখিল—কিশোর নয়—সম্মুখে নরেশ।

এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিয়া অনিন্দিতা বিমূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার সমস্ত মুখ রক্তশূন্য বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহাতে তীব্র নৈরাশ্য ও বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিল।

এ সমস্ত নরেশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইল না। তাহার মুখ এক অদ্ভুত কুটীল হাসিতে অস্বাভাবিক রূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, চোখে একটা ক্রূর হিংসার বিদ্যুৎ দীপ্তি খেলিয়া গেল। নরেশ অতি ধীরে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল—

"আমি কিশোর নই, নরেশ! একটু নিরাশ হয়েছ, নয়? কিন্তু কি করবো, আমার দুর্ভাগ্য—!"

[অনিন্দিতার মনে হইল, এ তো মনুষ্য কণ্ঠ নয়। এ স্বর যেন কোন নৈশপ্রেতাত্মার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে, হেমন্তের উত্তর বায়ুর মতই তাহা শীতল, শাণিত ছুরিকার মতই তীক্ষ্ণ।)

নরেশ বলিতে লাগিল—"আমি জানি অনিন্দিতা, আমাকে দেখে তুমি সুখী হবে না, কিন্তু তবু আমাকে আসতে হল। মোহিত আজ নেই; শুনলেম, কিশোরের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও পুলিশের হাতে বন্দী হয়েছে। তুমি না বল্‌লেও এখন মোহিতের কর্ত্তব্য আমাকেই করতে হবে।"

অনিন্দিতা কোন উত্তর দিতে পারিল না। এই অদ্ভুত লোকটার নির্লজ্জতা দেখিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার বাক্‌ শক্তি যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; কেবল একটা দুর্জ্জয় ক্রোধ তাহার বক্ষস্থল আলোড়ন করিয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছিল।

—"মোহিত ও কিশোর কি গুরুতর অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে, তুমি হয়ত কল্পনাও করতে পার নাই। শুন্‌লে তোমার মনে খুবই আঘাত লাগবে, কিন্তু তবুও তোমার সব কথা জানা উচিত।"

তার পর এ দিক ওদিকে চাহিয়া, একটু থামিয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া নরেশ বলিল—"রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, খুন, ডাকাতি—"

অনিন্দিতার মুখদিয়া অতর্কিতে একটা অস্ফুট ভীতিসূচক শব্দ বাহির হইল। পরক্ষণেই মনের সমস্ত শক্তিতে আত্মদমন করিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে সে বলিল—

"এই সুসংবাদ দেবার জন্য আপনার কষ্ট ক'রে এতদূর আসবার প্রয়োজন ছিল না, নরেশ বাবু। ভগবান যখন এই নিদারুণ দুঃখের বজ্র আমাদের মাথায় নিক্ষেপ করেছেন, তখন তা সহ্য করবার শক্তিও তিনি নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু আপনি—"

"আমি তাদের মুক্ত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, কৃতকার্য্য হই নাই। যমের হাত থেকে হয়ত বা মানুষকে ছাড়িয়ে আনা যায়, কিন্তু এদের কবল থেকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। তাছাড়া, আমার নিজের অবস্থাও তো খুব নিরাপদ নয়।"

অনিন্দিতা ঈষৎ বিস্মিত ভাবে নরেশের দিকে চাহিল। নরেশ অনিন্দিতার সহানুভূতি লাভের এই ক্ষীণ সুযোগ টুকু ত্যাগ করিল না, বলিল—

"মোহিত ও আমি চিরদিনই একপথের পথিক, দুই জনে কত ঝড় ঝঞ্ঝা বিপদ একসঙ্গে অতিক্রম করেছি। কারাগারের অন্ধকারেও যে মোহিতের পাশে গিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে না, তা কে বলতে পারে? বিশেষতঃ যখন ;—"

নরেশ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনিন্দিতার মুখের দিকে চাহিয়া লইল, তারপর একটু জোরের সঙ্গেই বলিল—

"বিশেষতঃ যখন এর মধ্যে কিশোরের মত লোক জুটেছে। তোমরা কিশোরকে চিনতে পারনি, অনিন্দিতা—আমার ঘোর সন্দেহ যে, তার জন্যই

মোহিত ধরা পড়েছে, হয়ত আমাকেও বন্দী হতে হবে। দুধ দিয়ে কালসাপ পুষলেও সে তার স্বভাব ত্যাগ করতে পারে না।" )

অনিন্দিতা আহতা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল।

—"নরেশ বাবু, আপনার স্পর্দ্ধা ক্রমেই সীমা অতিক্রম করছে। একজন নির্দ্দোষ দেবচরিত্র লোকের নামে এমন মিথ্যা হীন কুৎসা করতে আপনার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা হচ্ছে না? আমি জানতুম, গুপ্তঘাতকেরাই পিছন দিক থেকে আঘাত করে, বীরের ধর্ম্ম তা নয়।"

নরেশ অবিচলিতকণ্ঠে বলিল—"অনিন্দিতা আমার উপরে তুমি অকারণে রাগ করছো। আমার অপরাধ—যা সত্য, তা অপ্রিয় হলেও, তোমারই কল্যাণের জন্য প্রকাশ করেছি।"

অনিন্দিতা কোন কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মুখেচোখে একটা অসহ্য ক্রোধ ও ঘৃণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

নরেশ বলিল—"শোন অনিন্দিতা, তুমি আমার উপর যতই ক্রুদ্ধ হও, আমি কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তে তোমারই কল্যাণ চিন্তা করছি। তুমি আমাকে ভালবাস না জানি, কিন্তু তবু আমার এ চিন্তা না ক'রে পরিত্রাণ নাই,—কেননা—আমি তোমাকে ভালবাসি।"

অনিন্দিতা তাহার সর্ব্বশরীরে যেন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করিল, শিরায় শিরায় রক্ত কণিকাগুলি টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। নরেশের দিকে দুই তীক্ষ্ণ চক্ষুর জ্বলন্ত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রাণীর মতই সদর্পে গ্রীবা বাঁকাইয়া সে বলিল—

"আপনি কি আমাকে অপমান করতে এসেছেন নরেশ বাবু? আমি জানতুম, আপনি আমার দাদার বন্ধু,—কিন্তু এখন দেখছি বন্ধুর ছদ্মবেশে আপনি গুপ্তঘাতকের চেয়েও ভয়ঙ্কর।"

নরেশ সহসা জানু পাতিয়া অনিন্দিতার সম্মুখে বসিয়া পড়িল এবং মিনতি কাতর কণ্ঠে বলিল—

"আমাকে বিশ্বাস কর, অনিন্দিতা। আমি তোমাকে ভালবাসি, এই দেহের প্রত্যেক অনুপরমাণু দিয়ে ভালবাসি;—বোধ হয় কোন পুরুষ কোন নারীকে এর পূর্ব্বে এত ভালবাসেনি। জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তোমার রূপের শিখা—আমার সমস্ত হৃদয়কে পুড়িয়ে ছাই করেছে;—তাকে রোধ করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি—"

বিষাক্ত সর্পের দংশন ভয়ে লোকে যেমন দশহাত পিছাইয়া যায়, অনিন্দিতা তেমনি ভয়ে ক্রোধে—ঘৃণায় পিছাইয়া গেল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—

"বিশ্বাসঘাতক—হীন—কাপুরুষ! অসহায়া নারীকে একাকী পেয়ে—"

নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা পশ্চাৎদিক হইতে বজ্রমুষ্টিতে কে তাহার দক্ষিণ প্রকোষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া পরুষ কণ্ঠে বলিল—

—"নরেশ বাবু, তোমার যে এতদূর অধঃপতন হয়েছে, তা জান্‌তেম না। তুমি নাকি দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছ?—এ তারই যোগ্য পরিচয় বটে! কিন্তু মোহিতদা না থাকলেও, তাঁর বোন যে অসহায়া নন, এটা ভাল করেই জেনে রাখুন।—"

বলিয়া কিশোর উন্নত শিরে তাহার বিশাল বক্ষ বিস্তৃত করিয়া নরেশের সম্মুখে দাঁড়াইল।

সহসা সম্মুখে গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও বোধ হয় নরেশ এমন স্তম্ভিত হইত না। কিশোরের বজ্রমুষ্টিতে তাহার শরীর ঝিম ঝিম করিতেছিল, আর কোন কথা না বলিয়া সে মাতালের মত টলিতে টলিতে কোনরূপে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

কিশোর ও অনিন্দিতা পলকহীন নেত্রে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।

## ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আলিপুর জেলের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে কয়েদীর বেশে মোহিত একাকী। কাল বিচারকের মুখে সে জানিতে পারিয়াছে যে, সে গুরুতর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও হত্যা প্রভৃতি বহু অপরাধের জন্য দণ্ডিত, শাস্তিস্বরূপ তাহার প্রতি চিরনির্ব্বাসনের আদেশ হইয়াছে। সেই ভয়াবহ দণ্ডের কথা শুনিয়া মোহিত শুধু একটু হাসিয়াছিল ;—সে হাসি প্রশান্ত, মধুর,—যেন যুদ্ধ শ্রান্ত বিজয়ী সৈনিকের হাসি।

আজও মোহিতের অধরে সেই প্রসন্ন হাস্য, বদনমণ্ডল তৃপ্তির গর্ব্বে উজ্জ্বল। প্রভাতসূর্য্যের সোনালী কিরণ রেখা, সেই অন্ধকার কারাগৃহের বাতায়ন দিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছিল, যেন বহির্জগৎ হইতে আজ তারা কোন সুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। মোহিত একমনে বাতাসে নর্ত্তনপর ধূলিকণার সঙ্গে সোনালী কিরণের খেলা দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, কিসের এই সুসংবাদ? বহির্জগতের দ্বার আজ তাহার নিকট রুদ্ধ, হয়ত চিরদিনের মতই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেখানকার সুখদুঃখ, হাসিকান্নার সঙ্গে, আনন্দ উৎসব বিষাদের সঙ্গে আর সে যোগ দিতে পারিবে না,—সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র, সকলেই আজ তাহাকে অস্পৃশ্যের মত বর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু এই নির্ব্বাসন দণ্ড সে কি সহ্য করিতে পারিবে না? কেন পারিবে না? সে তো স্বেচ্ছাতেই এই দণ্ড মাথায় পাতিয়া লইয়াছে। আচার্য্য বলিয়াছেন, লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য এমন কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, কেননা দেবীর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তার মধ্যে মোহিতের ক্ষুদ্র জীবনের কি মূল্য?

অনিন্দিতার নিকট মোহিত প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিল, যে,

কিশোরকে সে ফিরাইয়া দিবে। তাহার প্রতিশ্রুতি সে রাখিতে পারিয়াছে, এই ভাবিয়া মোহিত মনে মনে আনন্দ অনুভব করিল। কিশোরের প্রতি মোহিতের ভালবাসা অসীম, তাহার যদি কোন ছোট ভাই থাকিত, তাহাকেও বোধ হয় মোহিত এর চেয়ে বেশী ভালবাসিতে পারিত না। এমন সবল বাহু, বজ্র কঠিন প্রশস্ত বক্ষ,—অথচ তাহার অন্তরালে, পাষাণের অন্তরালে স্নিগ্ধ নির্ঝরিণীর মতোই এমন সরল কোমল স্নেহময় হৃদয়—বাঙ্গলা দেশে এমন আর কয়টী ছেলে মিলে। অনিন্দিতা যে কিশোরের এই সবল অনাবিল মনুষ্যত্বকে খুবই শ্রদ্ধা করে, মোহিত তাহা জানে। কিন্তু সেই শ্রদ্ধায় কি অনুরাগের রেখাপাত হইয়াছে—নির্ম্মল পূর্ব্বাকাশে উষার রক্তিম রাগের মতোই? আর কিশোর? মোহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, অনিন্দিতার প্রতি এই তরুণ যুবকের অন্তরে গভীর প্রীতি জাগিয়াছে; ভক্ত যেমন আরাধ্যা দেবীকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া বসে, হয়ত বা কিশোরও তাহাই করিয়াছে! এই দুইটী তরুণ-তরুণী যদি জীবনযাত্রার দুর্গমপথে পরস্পরের প্রতি নির্ভর করিয়া চলে, তবে সে নির্ব্বাসনে থাকিয়াও শান্তি পাইবে। আর তাহার স্নেহময়ী মা—তাঁহার অধম সন্তান কোনদিন কোনরূপেই তাঁহাকে সুখী করিতে পারে নাই। হয়ত তাহার নির্ব্বাসনের নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া তিনি শয্যা হইতে আর উঠিতে পারিবেন না! কিশোর ও অনিন্দিতা কি তাঁহাকে একটু শান্তি দিতে পারিবে না?

তাহার নিজের কাম্য আর কিছুই নাই! সমস্ত কর্ম্মফলই সে দেশমাতার চরণে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে—সে নিজের জন্য কিছুই চায় না! কিন্তু ইহাই কি সম্পূর্ণ সত্য, হৃদয়ের কোন গোপন কক্ষে, অন্তরের অন্তঃস্থলে কি তাহার কোন কামনা—কোন বাসনাই লুকাইয়া নাই? নিজের হৃদয়কে মোহিত ফাঁকি দিতে পারিল না, কেন না বিশ্বজগতকে

ফাঁকি দিলেও, ঐ এক জায়গায় মানুষ তাহার দেনা চুকাইয়া দিতে বাধ্য।

মোহিত জীবনে আর কিছুই চায় না, কেবল শেষ বিদায়ের পূর্ব্বে একবার যদি তাহাকে দেখিতে পাইত, তবে যাহা কোনদিন তাহাকে বলে নাই, কোনদিন প্রকাশ্যে স্বীকার করে নাই, তাহাই আজ তাহাকে বলিয়া যাইত ;—আর সঙ্গে সঙ্গে এই দীর্ঘ নির্ব্বাসন-যাত্রার সম্বল লইয়া যাইত। বলিত, সেদিন সমাজের তাড়নায়, তাহারই মঙ্গলের জন্য, তাহার বুকে যে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল,—সে আঘাত মোহিতের নিজের বুকেই সহস্রগুণ বেগে বাজিয়াছে!

কিন্তু বিদায়ের পূর্ব্বে তাহাকে সে কিরূপে দেখিবে? সে যে অসম্ভব কল্পনা! এই দুর্ভেদ্য কারাগারে, নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত, একজন কয়েদীর সঙ্গে সে কেমন করিয়া আসিয়া দেখা করিবে? হয়ত নির্ব্বাসনের সংবাদ সে জানিতেই পারে নাই ; জানিলেও তাহার বাবা-মা, তাহাকে আসিতে দিবেন কেন?

মোহিতের মনে পড়িল আদালতের সেই করুণ দৃশ্য! পুলিশ প্রতিমার বাবাকে সাক্ষীরূপে কাঠগড়ায় হাজির করিয়াছিল। অপহৃত রিভলভার যখন তাঁহাকে দেখানো হইল, তখন বৃদ্ধ কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। শেষে বিচারকের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে যেন হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছিঁড়িয়া তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল—"হ্যাঁ, আমারই।" কিন্তু পরক্ষণেই বৃদ্ধের সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভূতলে পতিত হইল। বৃদ্ধ করুণাময় বাবু সেই আঘাত সামলাইয়া উঠিতে পারিয়াছেন কি না, কে জানে! প্রতিমা না জানি এখন কী বিষম দুর্ভাবনা ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাইতেছে! যদি মোহিত একবার তাহাকে দেখিতে পাইত, হয়ত তাহার দুঃখে একটু সান্ত্বনা দিতে পারিত!

আজ এই কারাগারে মোহিতের শেষ দিন! আর কয়েক ঘণ্টা পরেই কোন অজানা দেশে তাহাকে যাইতে হইবে। কারাগারের মধ্যে থাকিয়াও মোহিত স্বদেশের আকাশ বাতাস মৃত্তিকার যে স্নেহময় স্পর্শ লাভ করিতেছে, ভবিষ্যতে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইবে। হোক্ তাহাতে ক্ষতি নাই, যদি তাহার মত একজন নগণ্য সন্তানের নির্ব্বাসনের ফলে জননী জন্মভূমির দুঃখ কষ্ট দূর করিবার বিন্দুমাত্রও সাহায্য হয়! সেদিন আর কত দূরে?—মোহিতের মন সুদূর ভবিষ্যতের গৌরবময় স্বপ্নের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

( ২ )

মোহিত কতক্ষণ এইরূপ স্বপ্নের মধ্যে ডুবিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। হঠাৎ দ্বারখোলার শব্দে জাগিয়া উঠিল—চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে প্রতিমা দাঁড়াইয়া, তাহার পশ্চাতে একজন কারারক্ষী। মোহিত নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না,—ভাবিল, এ বুঝি তাহার পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্নেরই আর এক অধ্যায়। সে ভাল করিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিল, স্বপ্নের ঘোর দূর করিবার জন্য দুই হস্তে নিজের মাথা ধরিয়া ঝাঁকাইল। আবার চাহিয়া দেখিল—সেই অনিন্দ্যসুন্দর, ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি, তাহার দিকে বিষাদম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, মুখে বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুই গণ্ড বহিয়া ফোটা ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

মোহিত ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল—"একি, প্রতিমা—তুমি এখানে!"

প্রতিমা কোন উত্তর দিল না, দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া মোহিতের পায়ের কাছে বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মোহিত তাহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে বুঝিতে পারিল না,—শুধু প্রতিমার মাথায় ধীরে ধীরে নিজের দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিল।

বোধহয় মোহিতের সেই স্নেহময় স্পর্শের মধ্যে কি একটা অপূর্ব্ব শক্তি

ছিল, যাহাতে তীব্র দুঃখের মধ্যেও প্রতিমার মন কিঞ্চিৎ শান্ত হইল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া মুখ তুলিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল—

"তোমাকে এভাবে এবেশে দেখ্‌তে হবে, কোনদিন কল্পনাও করি নি—"

মোহিত জোর করিয়া তাহার কণ্ঠে একটা উল্লাসের ভাব আনিতে চেষ্টা করিল, তার পর সহজ লঘু ভঙ্গীতেই বলিল—

"এ কল্পনা অনায়াসাসেই তুমি করতে পারতে, প্রতিমা। যে খুনে—ডাকাত,—ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে রিভলভার চুরি করে, তার যোগ্য শাস্তিই তো এই। এর জন্য দুঃখ ক'রে তো লাভ নেই—"

প্রতিমা তিরস্কারের সুরে বলিল—"মোহিতদা—এখনও—"

মোহিত প্রতিমার দিকে ভাল করিয়া চাহিল।

তরুণীর সেই অভিমানস্ফুরিত অধরে, দীপ্ত চক্ষুতে এবং আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বরের মধ্যে নারীত্বের এমন এক অনির্ব্বচনীয় মহিমা মোহিত দেখিতে পাইল, যাহার নিকট তাহার হৃদয় সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসিল। কৃত্রিম উল্লাস ও লঘুতার ভাব ত্যাগ করিয়া ধীর প্রশান্তকণ্ঠে মোহিত বলিল—

"এর জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী, প্রতিমা। আমি স্বেচ্ছায় তাদের বন্ধন স্বীকার করে নিয়েছি, নির্ব্বাসন দণ্ড মাথা পেতে গ্রহণ করেছি"—

"কেন এমন কর্‌লে?

"কেন করলেম? নির্দ্দোষীকে বাঁচাতে গিয়ে। আমার কৃতকার্য্যের ফল আর একজন ভোগ করবে, একি হতে পারে?—" তারপর ঈষৎ ম্লান হাসিয়া বলিল—"এখানেও প্রতিযোগিতার ঈর্ষা আছে, প্রতিমা। দেশসেবার পুরস্কার—জয়মাল্য আমাকে বঞ্চিত করে, আর একজন গ্রহণ করবে, আমি নীরবে তা সহ্য করতে পারলেম না। ওই নিরপরাধ তরুণ কিশোরকে

নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে আমি সমস্ত পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকবো—তুমিই কি এটা গৌরবের কাজ মনে করতে প্রতিমা—”

প্রতিমা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না, কেবল তাহার দুই চক্ষু হইতে ফোটা ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়া গণ্ডস্থল সিক্ত করিয়া তুলিল।

মোহিত প্রশান্ত দৃষ্টিতে প্রতিমার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

“আজ দুঃখের দিন নয়, প্রতিমা, আনন্দের দিন। এ আনন্দের দিনে তোমার মুখে আমি হাসি দেখ্‌তে চাই, কেন না, সেই অমূল্য সম্পদটুকু নিয়েই আমি নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করবো। হয়ত ইহলোকে আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, কিন্তু যদি পরলোক থাকে, তবে সেখানে আর একবার তোমাকে দেখার প্রতীক্ষায় থাকবো। আমার অবিশ্বাসী হৃদয় কোনদিন জন্মান্তর মান্‌তে চায় নি। এখন মনে হচ্ছে, জন্মান্তর হয়ত সত্য। যদি আবার জন্মাতে হয়, তবে যেন এই দুর্ভাগ্য দেশেই জন্মাই এবং এর কষ্ট মোচনের জন্যই আবার লেগে যাই। এর চেয়ে বড় কামনা আমার আর কিছু নেই।”

মোহিতের কথা শুনিতে শুনিতে প্রতিমার হৃদয় গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। তবু অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া সে স্থির কণ্ঠেই বলিল—

“এ সব তুমি কি বল্‌ছ? আমার মন বল্‌ছে—এই জন্মেই, এই পৃথিবীতেই তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। দশ বিশ বৎসর জীবনের খুব বেশী সময় নয়। আমি সমস্ত অন্তরের সঙ্গে জানি, তুমি আবার ফিরে এসে জন্মভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ ক'র্‌বে। পরলোকে নয়, ইহলোকেই আমি তোমার পথ চেয়ে থাকবো!”

মোহিতের সর্ব্বশরীরে যেন একটা আনন্দপ্রবাহ বহিয়া গেল, মন অপূর্ব্ব

অমৃত রসে সিঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে প্রবল উল্লাস জোর করিয়া দমন করিয়া সে বলিল—

"তোমার জীবনপথে যাত্রা কেবল আরম্ভ হয়েছে। কত আশা, কত আনন্দ তোমার এখনো অপূর্ণ। আমার মত ব্যর্থজীবন, রাজ দ্বারে দণ্ডিত নির্ব্বাসিত হতভাগ্যের জন্য, কেন তুমি তোমার সমস্ত জীবন দুঃখময় ক'র্‌বে, প্রতিমা? আমার শেষ অনুরোধ,—তুমি জীবনে সুখী হও, আমার কথা ভুলে যাও—"

প্রতিমার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল,—যেন শরতের নির্ম্মেঘ আকাশে বিদ্যুদ্দীপ্তি ঝলসিয়া গেল; উত্তেজনায় তাহার ললাট গণ্ডস্থল রক্তিম হইয়া উঠিল। মোহিতের মুখের উপর স্থির অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল—

"এখনও তুমি আমাকে অপমান ক'রতে সাহস পাও? তুমি কি জান না, নারীরও একটা মর্য্যাদা—আত্মসম্মান আছে, আর তা পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়? একদিন তোমাকে বলেছি,—আজ আবার বলছি,—নারী একবারই হৃদয় দান কর্‌তে পারে, সে হৃদয় নিয়ে ব্যবসা করতে জানে না। পুরুষের কাছে যা হয়ত খেলা, নারীর কাছে তাই তার জীবনের সর্ব্বস্ব। কতদিন তোমার মুখে প্রাচীন ভারতের মেয়েদের কথা শুনেছি। তুমি কি ভুলে যাচ্ছ, আমরাও এই প্রাচীন দেশেরই মেয়ে? সাবিত্রী—দময়ন্তী জীবনে একবারই স্বামী বরণ করেছিলেন, মৃত্যু, নির্ব্বাসন কিছুতেই তাঁদের সঙ্কল্পচ্যুত ক'রতে পারে নি—"

শান্ত, স্বল্পভাষিণী প্রতিমার মুখে এতগুলি কথা বোধ হয় কোনদিনই যোগায় নাই। আজ সে নিজের প্রগল্‌ভতায় নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল। কতকটা লজ্জায়—কতকটা উত্তেজনার অবসাদে সে দুই হাতে মুখ লুকাইল।

মোহিত কিছুক্ষণ বিস্ময়ে আনন্দে বিমূঢ়ের মতো বসিয়া রহিল।

তার পর ধীরে ধীরে প্রতিমার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া আবেগময় কণ্ঠে কহিল—

"তবে তাই হোক, তোমার ইচ্ছাই জয়ী হোক, প্রতিমা। কোনদিন তোমাকে মুখ ফুটে বলিনি, আজ বলি—তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। কৈশোরের স্বপ্নলোকে যে মানসী-প্রতিমা হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই আজ যৌবনে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে সেখানে বিরাজ করছে।"

প্রতিমা যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে ডুবিয়া গেল। তাহার মস্তক তাহার অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে মোহিতের স্কন্ধে ন্যস্ত হইল, দুই চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

*　　*　　*　　*　　*

দ্বারে গুরু পদক্ষেপ ও অস্ত্র ঝনৎকারের শব্দ শোনা গেল। মোহিত ও প্রতিমা দেখিল—কারাধ্যক্ষ সঙ্গীনধারী কয়েকজন রক্ষীর সঙ্গে উপস্থিত। কারাধ্যক্ষ মোহিতের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

"নমস্কার মোহিত বাবু, আপনার যাত্রার সময় হয়েছে, প্রস্তুত হন।" তার পর প্রতিমার দিকে চাহিয়া—মাথা ঈষৎ নোয়াইয়া বলিলেন— "মিস্, আপনিও এখন যেতে পারেন, এই প্রহরী আপনাকে বাইরে রেখে আস্‌বে।"

---

## ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সীমাহীন গাঢ় অন্ধকার ধরণীকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। একে কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি, তাহার উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ;—সে অন্ধকার ভেদ করিয়া একটী নক্ষত্রেরও ক্ষীণ জ্যোতিঃরেখা প্রকাশ হইতে পারিতেছে না। কিশোরের হৃদয়ও আজ এমনই বিষাদের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেখানে একটী আশার রেখাও নাই,—সুদূর ভবিষ্যতের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবলই সীমাহীন অন্ধকার।

—এ জগতে আজ সে একা। স্নেহ মমতার কোন বন্ধন, কোন আশ্রয়, কোন অবলম্বন তাহার নাই। জগতে তাহার মতো এমন হতভাগ্য আর কে আছে? অর্থ সকলের থাকে না বটে, কিন্তু স্নেহ, দয়া, মমতা—ভালবাসার বস্তু—এ সকল হইতে তাহারা তো বঞ্চিত নয়। ওই কারখানাতে তাহার যে সব সহকর্ম্মী ছিল, তাহাদের অনেকেই তো দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইত না। কিন্তু তবু তাহাদের অসীম দারিদ্র্যের মধ্যেও, আপনার জন বলিয়া নির্ভর করিবার কেহ ছিল ;—স্নেহময়ী মাতা, সেবাপরায়ণা ভগ্নী, পতিব্রতা পত্নী, আনন্দের নির্ঝরতুল্য পুত্র কন্যা। কিন্তু কিশোরের জীবন বিশাল শুষ্ক মরুভূমিবৎ,—যে দিকে দৃষ্টি ফিরায়, সেই দিকেই দিগন্ত বিস্তৃত বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে।

কিশোর শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল। চারিদিকে নির্জ্জন নিস্তব্ধ, এমন কি বাতাসও নিশ্চল হইয়া গিয়াছে ;—সেই নীরবতার মধ্যে আপনার হৃৎপিণ্ডের পতনের শব্দও যেন কিশোর

শুনিতে পাইল। দূরে ঢং ঢং করিয়া কোন একটা ঘড়ীতে দুইটা বাজিল। কিশোর সে শব্দে চমকিয়া উঠিল।

জীবনে এমন কি অপরাধ করিয়াছে সে, যে, তাহার উপর এই অভিশাপ—এই কঠোর শাস্তি! তাহার স্নেহময়ী জননী—কোন অভিশাপে তাহাকে অকালে পরিত্যাগ করিয়া গেল? তার পর, আর একজনের স্নেহের আশ্রয় সে লাভ করিয়াছিল। মোহিত দা ছোট ভাইয়ের মতোই তাহাকে ভাল বাসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অভিশপ্ত জীবনের স্পর্শে সেই মহাপ্রাণ বীরও আজ চিরজীবনের জন্য দেশ হইতে নির্ব্বাসিত।

এই অবিচার অত্যাচার নিষ্ঠুরতা,—ইহার জন্য দায়ী কে? ভগবান? বাল্যকাল হইতেই সে তো শুনিয়া আসিতেছে যে, ভগবান স্নেহময়, করুণাময়? কিন্তু এই কি তাঁহার স্নেহ ও. করুণার পরিচয়? তিনি যদি করুণাময়ই হইবেন,—তবে পৃথিবীতে এই দুঃখ, দারিদ্র্য, অবিচার, অত্যাচার কেন হইতেছে? হয়,—ভগবান বলিয়া কেহ নাই, লোকের কল্পনা মাত্র, অথবা থাকিলেও তিনি দয়াময় নহেন, কাহারও সুখ দুঃখে বিচলিত হন না, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন তিনি—

সহসা কিশোরের মনে হইল, এই গৃহ, এই আশ্রয়—তাহাকে তো ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এই গৃহের সঙ্গে, ইহার প্রত্যেকটী স্থানের সঙ্গে, প্রত্যেকটী বস্তুর সঙ্গে, তাহার কতদিনের স্মৃতি জড়িত। এখানে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে, সে যে স্নেহ ভালবাসা লাভ করিয়াছিল,—তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে, দেহের প্রত্যেক রক্ত কণিকার সঙ্গে, তাহা যে মিশিয়া আছে; মর্ম্মের গ্রন্থির সঙ্গে তাহা যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা! সেই মর্ম্ম গ্রন্থিও আজ তাহাকে ছিন্ন করিতে হইবে।

মোহিত দা ছাড়া আর একজন তাহাকে স্নেহ ও করুণা দিয়া ঘিরিয়া

রাখিয়াছিল, সেবানিপুণ অক্লান্ত হস্তে তাহার দুঃখ দারিদ্র্য বিধ্বস্ত জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার কথাই বা সে কিরূপে ভুলিবে? সে স্বর্গের দেবী,—তাহাকে চিরদিনই সে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাভরে হৃদয়ের অর্ঘ্য দিয়াছে,—তাহার বেশী কোনদিনই অগ্রসর হইতে সাহস পায় নাই। কিন্তু আজ কিশোর নিজের হৃদয়ের অভ্যন্তরে চাহিয়া দেখিল,—সমস্ত সম্ভ্রম ও দূরত্বের ব্যবধান ভেদ করিয়া কখন যে সেই দেবী মূর্ত্তি তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সে তাহা জানিতেও পারে নাই!

কিন্তু এ কি তাহার স্পর্দ্ধা! সে দরিদ্র, মূর্খ, ভবঘুরে,—সমাজে তাহার কোন স্থান নাই, কারখানার কুলীদের সঙ্গে মোট বহিয়া, মাটি কাটিয়া, তাহার জীবন গিয়াছে;—সে কিনা, ওই স্বর্গের দেবীকে ভালবাসিবার স্বপ্ন অন্তরে পোষণ করে! রূপকথায় আছে, একজন ভিক্ষুক রাজকন্যাকে স্বপ্নে দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। সেই ভিক্ষুকের স্পর্দ্ধার মতোই, তাহার নিজের দুরাকাঙ্ক্ষা হাস্যকর। সমাজ যদি এ কথা জানিতে পারে, তবে ঘৃণাভরে তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবে;—অনিন্দিতা যদি তাহার অন্তরের গোপন ভাব বুঝিতে পারে, তবে লজ্জায় হয় তো মরিয়া যাইবে।

না, তাহার এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের একমাত্র শাস্তি,—এই স্থান হইতে নির্ব্বাসন। এই গৃহ, এই কক্ষ, এই বাগান,—ওই গঙ্গার ঘাট, তাহার প্রিয়তম স্থান, তাহার তীর্থ ক্ষেত্র। আজ স্বেচ্ছায় এই তীর্থক্ষেত্র তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে;—নিজের অপরাধের শাস্তি এই ভাবে তাহাকে মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে। সে জানে, এ আঘাতে তাহার হৃদয় মুহ্যমান হইয়া পড়িবে, দগ্ধ বনস্পতির মতো তাহার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তবু এই আঘাত তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে,—উপায় নাই, উপায় নাই!

অদূরে একটী নিশাচর পক্ষী গম্ভীরস্বরে ডাকিয়া উঠিল,—একখানা

মোটর গাড়ী বাঁশী বাজাইয়া, সশব্দে চারিদিক কম্পিত করিয়া, অধীর বেগে ছুটিয়া গেল। কিশোরের চিন্তাসূত্র ক্ষণকালের জন্ম ছিন্ন হইল।

—এই জগতে ভালবাসার বস্তু এত দুর্ল্লভ কেন? বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সমাজ এমন দুর্ল্লঙ্ঘ্য কৃত্রিম প্রাচীর খাড়া করিয়াছে কেন? কিশোরের মনে হইল,—সে যদি কুলী না হইত, যদি সে আর দশজনের মতোই শিক্ষিত হইত, সমাজে তাহার স্থান থাকিত,—পদ, মান, মর্য্যাদা থাকিত,—তবে তো অনিন্দিতা তাহার নিকট এমন দুর্ল্লভ হইত না। তবে হয়ত অনিন্দিতার নিকটে সাহস করিয়া সে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিতে পারিত,—আর তাহা হইলে—হয়ত বা—হয়ত বা—। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য বিধানের নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে, সমাজব্যবস্থার পীড়নে,—সে নিরুপায় বন্দী, তাহার পক্ষে ভালবাসা অপরাধ,—চিরবাঞ্ছিতাকে লাভ করিবার ইচ্ছা মহাপাপ!

সমাজে কেন এই বৈষম্য?—ধনের বৈষম্য, পদমান মর্য্যাদার বৈষম্য? অনিন্দিতার নিকটে সে শুনিয়াছে যে, এই সব বৈষম্য কৃত্রিম,—মানুষ ইহাকে জোর করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিজের পায়ে নিজে এই শৃঙ্খল রচনা করিয়াছে। এখন সেই নিজের হাতে গড়া শৃঙ্খলই তাহার পক্ষে দুর্ব্বহ বেদনাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের সেই গোড়ার ইতিহাসে, প্রবল দুর্ব্বলকে প্রবঞ্চিত করিয়া, সমস্ত সুখ ও ঐশ্বর্য্য নিজেরাই আত্মসাৎ করিয়াছিল; আর দুর্ব্বলকে করিয়াছিল,—কৃতদাস, বন্দী—শূদ্র! গোড়ার সেই কৃত্রিম ইতিহাসের ধারাই যুগের পর যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই;—দুর্ব্বল আরও নিষ্পেষিত হইয়াছে, দরিদ্র ধনীর কারাগারে আরও কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছে। মানুষ মানুষকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, প্রতারণা করিয়াছে,—তাহার হৃদয় শোণিত পান করিয়াছে। সমস্ত মানব সভ্যতার ইতিহাস,

প্রবঞ্চনা—প্রতারণার ইতিহাস, নিষ্ঠুরতার ইতিহাস—শোষণের ইতিহাস। ব্যক্তি ব্যক্তির উপরে যাহা করিয়াছে, প্রবল জাতিবা দল বাঁধিয়া দুর্ব্বল জাতির উপরেও ঠিক তাহাই করিয়াছে।

তাই আজ মানবসমাজ যেন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে ধনী, মানী, সম্ভ্রান্ত, অভিজাতের দল,—ইহারাই প্রবল পক্ষ; আর একদিকে দরিদ্র, অশিক্ষিত, আভিজাত্যহীন, নির্য্যাতিতের দল,—ইহারা দুর্ব্বল পক্ষ। এই কৃত্রিম ব্যবধান দূর করিতে হইবে, মানুষের হাতে গড়া সংস্কারের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। নতুবা মানুষের পরিত্রাণ নাই।—

বাহিরের গাঢ় অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল, বিহঙ্গকুল কলরব করিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল, রাজপথে লোকজন ও যানবাহনের চলাচল আরম্ভ হইয়াছিল। কিশোর পরিত্যক্ত শয্যার দিকে একবারে ক্ষুণ্ণ মনে চাহিল, তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহা গুটাইয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

---

## একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অনিন্দিতা বাগানের মধ্যে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে গঙ্গাপ্রবাহের দিকে চাহিয়াছিল। প্রভাতসূর্য্য তখনো পূর্ণরূপে কিরণ বিস্তার করে নাই, কেবল তার অগ্রগামী অরুণ রেখা, গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গের উপরে খেলা করিতেছিল। আকাশে একখণ্ডও মেঘ ছিল না। নির্জ্জন প্রভাতে গঙ্গাতীরে সেই নির্ম্মল নীলাকাশের শোভা বড়ই শান্ত, বড়ই স্নিগ্ধ। কিন্তু প্রতিমার চিত্তে এ দৃশ্য দেখিবার মতো শান্তি ছিল না। সমস্ত রাত্রি তাহার দুই চোখে নিদ্রা আসে নাই। তরুণ হৃদয় উদ্বেগ ও সংশয়ের তীব্র দাহে দগ্ধ হইতেছিল। কয়েকদিন পূর্ব্বেও যে অনিন্দিতাকে দেখিয়াছে, সে আজ তাহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিবে না, এই সেই হাস্যময়ী, লীলাচঞ্চলা, তরুণী। তাহার উজ্জ্বল প্রতিভাময় চক্ষুর দৃষ্টি ক্লান্ত, অবসন্ন,—সদাপ্রফুল্ল মুখের উপর বেদনার ছাপ পড়িয়াছে, মার্জ্জিত হেমমুকুর সদৃশ ললাট ছায়াচ্ছন্ন।

অনিন্দিতা অন্যমনস্কভাবে গঙ্গাবক্ষে তরঙ্গের খেলা দেখিতেছিল; ভাবিতেছিল, জীবনের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা—সে কি এই গঙ্গা প্রবাহের বীচিবিক্ষোভেরই মতো,—মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিতেছে, মুহূর্ত্তে অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। জীবনের প্রথম প্রভাতে সে যে উচ্চ আদর্শের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, আজ দুঃখ ও নৈরাশ্যের প্রবল আঘাতে, তাহা কি শতধা ভাঙ্গিয়া পড়িবে? তাহার দাদাকে সে চিরদিন দেবতার মতোই মনে মনে পূজা করিয়া আসিয়াছে। তাহার সেই দেবতুল্য দাদার সমস্ত ত্যাগ ও তপস্যা কি সুদূর নির্ব্বাসনের অসীম দুঃখের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে? এ জীবনে আর কি সে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না?

তবে কিসের জন্য, কাহার জন্য সে জীবন ধারণ করিবে? তাহার এ ব্যর্থ জীবনের অবলম্বন কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের কথা অনিন্দিতার মনে পড়িল. উন্নতদেহ, বলিষ্ঠ, তেজস্বী তরুণ কিশোরের কথা। এই তরুণের সঙ্গে তাহার কিছুদিন পূর্ব্বেও পরিচয় ছিল না। কিন্তু আজ অনিন্দিতা অন্তরের অন্তঃস্থলে চাহিয়া দেখিল, কিশোর সেখানে কতখানি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিশোর যে তাহাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে, অনিন্দিতা সহস্রবার তাহার প্রমাণ পাইয়াছে। কিন্তু অনিন্দিতা নিজে—সেও কি কিশোরকে—? অনিন্দিতা দুইহাতে মুখ ও চক্ষু আবৃত করিয়া আপনার অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিল। না—না—এ যে অত্যন্ত কঠোর সত্য! অনিন্দিতা আজ নিজের হৃদয়ের নিকটে পরাজিত, যে গর্ব্ব লইয়া সে প্রথম জীবনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ তাহা চূর্ণ! নারী কি এতই দুর্ব্বল, পুরুষ কি এত সহজেই তাহার হৃদয় জয় করিতে পারে!

আজ কিশোর হয়ত চিরদিনের মতো বিদায় গ্রহণ করিবে। তাহার মোহিত-দা নাই বলিয়া আর সে এ 'শূন্যপুরীতে' থাকিবে না। আবার সে কুলীদের মধ্যে ফিরিয়া যাইবে, সেইরূপ কঠোর শ্রমে জীবন কাটাইবে। অনিন্দিতার মনে অতি দুঃখের মধ্যেও অভিমান হইল। কেন, দাদা নাই বলিয়াই কি এ বাড়ী 'শূন্যপুরী' হইল? অনিন্দিতা কি কিছুই নয়? সে কি কিশোরকে কোনদিন একটুও ভালবাসে নাই, তাহাকে সুখী করিতে একবিন্দুও চেষ্টা করে নাই? পরক্ষণেই অনিন্দিতা জোর করিয়া উদ্যত অভিমান রোধ করিল। না,—সে আর বাধা দিবে না। তিনি যাইতে চান, যান; অনিন্দিতা তাহার নিসঙ্গ নিরানন্দ জীবন লইয়া অনন্ত নৈরাশ্যের মধ্যেই ডুবিয়া থাকিবে।

কিশোর কখন আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, গভীর চিন্তামগ্ন অনিন্দিতা তাহা জানিতে পারে নাই। বেদনাজড়িত গাঢ়কণ্ঠে কিশোর ডাকিল—"অনিন্দিতা!"

অনিন্দিতা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকিয়া পশ্চাতে ফিরিল। দেখিল কিশোর যাত্রার জন্য প্রস্তুত; তাহার কাঁধে সেই পুরাতন কম্বল, হাতে একগাছা মোটা লাঠি। অনিন্দিতা নীরবে নির্নিমেষ নয়নে কিশোরের দিকে চাহিয়া রহিল, কেবল তাহার মৃদু কম্পিত ওষ্ঠাধরে মনের আবেগ ব্যক্ত হইতে লাগিল।

কিশোর অনিন্দিতার দিকে চাহিতে পারিল না। সে বিষাদের প্রতিমার দিকে চাহিতে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, দৃঢ়সঙ্কল্প ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু না,—সে ইহাদের জীবনের পথে কণ্টক হইবে না,—সমাজের অন্যায় সংশয়ের বোঝা নিজের স্বার্থের জন্য ইহাদের মাথায় তুলিয়া দিবে না। সে মূর্খ কুলী—কুলীদের মধ্যেই জীবনযাপন করিবে। অতি কষ্টে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কিশোর বলিল—

"তবে, আজ বিদায়, অনিন্দিতা। তোমাদের কাছে বড় শান্তিতে ছিলাম; এমন স্নেহ, এমন সেবা মানুষের ভাগ্যে মিলে না। কিন্তু বিধাতা যার উপর চিরদিনই বাম, তার জীবনে শান্তি কোথায়? তার সমস্ত আশাই মায়ামরীচিকার মতো মিলিয়ে যায়।"

কিশোর অতি করুণভাবে হাসিল। অনিন্দিতা তবুও কোন কথা বলিতে পারিল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রহিল।

কিশোর বলিতে লাগিল—"যদি কোনদিন মোহিত-দা ফিরে আসেন, তবে আর একবার আস্‌বো। কিন্তু—বিধাতার ইচ্ছা কে জানে? আর হয়ত ফিরে না-ও আস্‌তে পারি, জীবনে আর কোনদিন হয়ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।" তারপর একটু থামিয়া বলিল—

"তুমি আমার স্মৃতি মনে রাখবে, এতবড় দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নেই; কেননা, আমি অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য। মূর্খ, দরিদ্র, কুলী আমি—যদি কোনদিন—"

কিশোরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে জোর করিয়া আপনার পদদ্বয়কে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিল।

সহসা কাতরকণ্ঠে অনিন্দিতা বলিল—"দাঁড়াও, এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার একটা কথা শুনে যাও।"

কিশোর ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ রক্তশূন্য, বিবর্ণ, হৃৎপিণ্ড বেগে কম্পিত হইতেছিল।

"তুমি কেন যাবে? তোমাকে আমি যেতে দেবো না, তোমার উপর কি আমার কিছুই দাবী নেই?"

"তোমার চেয়ে কার দাবী বেশী অনিন্দিতা? কিন্তু সমাজ—সংসার?"

দীপ্তকণ্ঠে অনিন্দিতা বলিল—"তুচ্ছ সমাজ, তুচ্ছ সংসার। এতবড় সাধ্য তাদের নেই যে, সত্যকে অগ্রাহ্য করে। আমি চিরদিনই সত্যকে চেয়েছি; আর লোকে যাই ভাবুক, আমি জানি, তুমি সত্যেরই পূজারী। সেই সত্যের বেদীমূলেই আমরা দুজনে আত্মোৎসর্গ করবো;—সংসারের তুচ্ছ সুখদুঃখ, মান অপমান তার তুলনায় কি এতই বড়?"

কিশোর মুগ্ধনেত্রে অনিন্দিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনিন্দিতা হাসিল,—সে হাসি প্রভাতের শুকতারার জ্যোতিঃর মতোই নির্ম্মল প্রশান্ত।

"—সে মহা সত্য আমি তোমার কাছেই শিখেছি। এই যে দীন দরিদ্র, মূর্খ, মূক জনসঙ্ঘ—যারা প্রবলের রথচক্রে পিষ্ট হচ্ছে, উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খেটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও পেট ভরে একমুটো খেতে পাচ্ছে না,—এরাই বৃহত্তর মানুষ, এরাই নরনারায়ণ। এদের পূজাতেই জীবন

উৎসর্গ করবো দুজনে আমরা। যে দিন দাদা ফিরে আসবে, সে দেখে তৃপ্ত হবে,—যে, তার আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয় নি।"

কিশোর নির্ব্বাক বিস্ময়ে অনিন্দিতার সেই তেজোদীপ্ত, আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রী দেখিতে লাগিল।

অনিন্দিতা বলিল—"তারা দেশ স্বাধীন করবার জন্যই প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু কাদের জন্য স্বাধীনতা ? এই যে লক্ষ লক্ষ নির্য্যাতিত, অপমানিত, অনাহারক্লিষ্ট—এরাই দেশ। এদের না জাগাতে পারলে, কোন দিনই স্বাধীনতা আসবে না। কোটী কোটী মরা মানুষ নিয়ে কি স্বাধীনতার সংগ্রাম চলে ? আমরা সেই অনাগত মনুষ্যত্বের পূজারী হব, তাদেরই উদ্বোধনে জীবন উৎসর্গ করবো। এই কি আমাদের দুজনের জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয় ?"

কিশোর কোন কথা কহিল না, কেবল ধীরে ধীরে অনিন্দিতার একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

তখন সূর্য্য দিগ্বলয় ছাড়িয়া উর্দ্ধদিকে উঠিতেছিল ; রাজপথে জন কোলাহল সুরু হইয়াছিল। অদূরে প্রতিবাসীর বাড়ীতে রোশনচৌকীর মধুর রাগিণী বাজিয়া বোধ হয় কোন বিবাহ উৎসবের আগমনী গাহিতেছিল। দেবমন্দিরে প্রথম আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কিশোর ও অনিন্দিতা যুক্তকরে নবযুগের অনাগত রুদ্রদেবতাকে উদ্দেশে প্রণাম করিল। পৃথিবী আজ তাহাদের নিকটে এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ; নীলাকাশ অপূর্ব্ব মাধুরী বিস্তার করিতে লাগিল, গঙ্গার বারি-প্রবাহ কল কল শব্দে যেন এক নূতন উৎসবের সূচনা করিল।

কিশোর স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল—"অনিন্দিতা !"

এবার অনিন্দিতা কোন কথা বলিল না, কিন্তু তাহার ঈষৎ সলজ্জ দৃষ্টির মধ্য দিয়া এক ভাষাহীন মাধুর্য্য কোন কল্পলোকের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল।

সমাপ্ত